ময়ূরাক্ষী
হুমায়ূন আহমেদ

এ্যাই ছেলে এ্যাই।

আমি বিরক্ত হয়ে তাকালাম। আমার মুখভরতি দাড়িগোঁফ। গায়ে চকচকে হলুদ পাঞ্জাবি পর পর তিনটা পান খেয়েছি বলে, ঠোঁট এবং দাঁত লাল হয়ে আছে। হাতে সিগারেট। আমাকে 'এ্যাই ছেলে' বলে ডাকার কোনোই কারণ নেই। যিনি ডাকছেন তিনি মধ্যবয়স্কা এক জন মহিলা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তাঁর সঙ্গে আমার একটি ব্যাপারে মিল আছে। তিনিও পান খাচ্ছেন। আমি বললাম, আমাকে কিছু বলছেন?

তোমার নাম কি টুটুল?

আমি জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। এই মহিলাকে আমি আগে কখনো দেখি নি। অথচ তিনি এমন আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন মনে হচ্ছে আমি যদি বলি 'হ্যাঁ আমার নাম টুটুল' তাহলে ছুটে এসে আমার হাত ধরবেন।

কথা বলছ না কেন? তোমার নাম কি টুটুল?

আমি একটু হাসলাম।

হাসলাম এই আশায় যেন তিনি ধরতে পারেন আমি টুটুল না। হাসিতে খুব সহজেই মানুষকে চেনা যায়। সব মানুষ একই ভঙ্গিতে কাঁদে, কিন্তু হাসার সময় একেক জন একেক রকম করে হাসে। আমার হাসি নিশ্চয়ই ঐ টুটুলের হাসির মতো না।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই ভদ্রমহিলা আমার হাসিতে আরো প্রতারিত হলেন। চোখমুখ উজ্জ্বল করে বললেন, ওমা টুটুলই তো।

ভাবছিলাম তিনি আমার দিকে ছুটে আসবেন, তা না করে ছুটে গেলেন রাস্তার ওপাশে পার্ক-করা গাড়ির দিকে। আমি শুনলাম তিনি বলছেন, তোকে বলি নি ও টুটুল! তুই তো বিশ্বাস করলি না। ওর হাঁটা দেখেই আমি ধরে ফেলেছি। কেমন দুলে দুলে হাঁটছে।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তার ওপাশে নিয়ে এল। ড্রাইভারের পাশের সিটটা খালি। ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, টুটুল উঠে আয়। আমি উঠে পড়লাম।

বাইরে চৈত্র মাসের ঝাঁঝাঁ রোদ। আমাকে যেতে হবে ফার্মগেট। বাসে উঠলেই মানুষের গায়ের গন্ধে আমার বমি আসে। কাজেই যেতে হবে হেঁটে

হেঁটে। খানিকটা লিফট পাওয়া গেলে মন্দ কী! আমি তো জোর করে গাড়িতে চেপে বসি নি! তাছাড়া...

আমার চিন্তার সূতা কেটে গেল। ভদ্রমহিলার পাশে বসে-থাকা মেয়েটি বলল, মা, এ টুটুল ভাই নয়।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ঠিক আগের ভঙ্গিতে হাসলাম। যে হাসি দিয়ে মেয়ের মাকে প্রতারিত করেছিলাম, সেই হাসিতে মেয়েটিকে প্রতারিত করার চেষ্টা। মেয়ে প্রতারিত হলো না। এই যুগের মেয়েদের প্রতারিত করা খুব কঠিন। মেয়েটি দ্বিতীয়বার আগের চেয়েও কঠিন গলায় বলল, মা, তুমি কাকে তুলেছ? এ টুটুল ভাই নয়। হতেই পারে না। এ অন্য কেউ।

ড্রাইভার বারবার সন্দেহজনক চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললাম, সামনে চোখ রেখে গাড়ি চালাও, এ্যাকসিডেন্ট হবে।

ড্রাইভার আমার গলা এবং কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। সম্ভবত তাকে কেউ তুমি করে বলে না। আমার মতো সাজপোশাকের মানুষ অবলীলায় তাকে তুমি বলছে এটা তার পক্ষে হজম করা কঠিন।

মেয়ের মা বললেন, আচ্ছা তুমি টুটুল না?

না।

মেয়েটি কঠিন গলায় বলল, তাহলে টুটুল সেজে গাড়িতে উঠে বসলেন যে?

টুটুল সেজে গাড়িতে উঠতে যাব কেন? আপনার মা উঠতে বললেন। উঠলাম।

মেয়েটি তীব্র গলায় বলল, ড্রাইভার সাহেব, গাড়ি থামান তো। ইনাকে নামিয়ে দিন।

যা ভেবেছিলাম তাই, এই ড্রাইভারকে সবাই আপনি করে বলে। ড্রাইভার মনে মনে হয়তো এ রকম হুকুমের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে ফেলল। বড় সাহেবদের মতো ভঙ্গিতে বলল, নামেন।

গাড়ি থেকে জোর করে নামিয়ে দেবে—এটা সহ্য করা বেশ কঠিন। তবে এ জাতীয় অপমান সহ্য করা আমার অভ্যাস আছে। আমাকে এবং মজিদকে একবার এক বিয়েবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। কনের এক আত্মীয় চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, জানেন আমরা আপনাকে পুলিশে হ্যান্ডওভার করতে পারি। ভদ্রবেশী জোচ্চরকে কীভাবে ঠাণ্ডা করতে হয় আমি জানি।

সেই অপমানের তুলনায় গাড়ি থেকে বের করে দেয়া তো কিছুই না।

ড্রাইভার রুক্ষ গলায় বলল, ব্রাদার নামুন।

সূর্যের চেয়ে বালি গরম একেই বলে। আমি ড্রাইভারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি ফার্মগেটে যাব। ঐখানে কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।

আমরা ফার্মগেটের দিকে যাচ্ছি না।

কোন্ দিকে যাবেন?

তা দিয়ে আপনার কী দরকার—নামুন বলছি।

না নামলে কী করবেন?

আমি এইবার ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আমার মনে ক্ষীণ আশা ভদ্রমহিলা বলবেন—এই ছেলে যেখানে যেতে চায় সেখানে নামিয়ে দিলেই হয়। এত কথার দরকার কী? ভদ্রমহিলা তা করলেন না। তিনি অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করছেন। অপরাধী ভঙ্গিতে মেয়ের দিকে তাকাচ্ছেন। সম্ভবত তিনি মেয়েকে ভয় পান। আজকাল অধিকাংশ মায়েরাই মেয়েদের ভয় পায়।

ড্রাইভার বলল, নামতে বলছে নামেন না।

আমি হুংকার দিয়ে উঠলাম, চুপ ব্যাটা ফাজিল। এক চড় দিয়ে চোয়াল ভেঙে দেব। আমাকে চিনিস? চিনিস তুই আমাকে?

ড্রাইভারের চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল। বড়লোকের ড্রাইভার এবং দারোয়ান এরা খুব ভিতু প্রকৃতির হয়, সামান্য ধমকাধমকিতেই এদের পিলে চমকে যায়।

আমার কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট নোটবইটা চেপে ধরলাম। ভাবটা এ রকম যেন কোনো ভয়াবহ অস্ত্র আমার হাতে। আমি ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বললাম, এই ব্যাটা গাড়ি স্টার্ট দে। আজ আমি তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট দিল। এই ব্যাটা দেখছি ভিতুর যম। বারবার আমার ব্যাগটার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বললাম, সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালা হারামজাদা। এ্যাকসিডেন্ট করবি।

আমি এবার পেছনের দিকে তাকালাম। কড়া গলায় বললাম, আদর করে গাড়িতে তুলে পথে নামিয়ে দেয়া এটা কোন্ ধরনের ভদ্রতা?

ভদ্রমহিলা বা তার মেয়ে দুই জনেই কেউই কোনো কথা বলল না। ভয় শুধু ড্রাইভার একা পায় নি—এরা দুই জনও পেয়েছে। মেয়েটাকে শুরুতে তেমন সুন্দর মনে হয় নি, এখন দেখতে বেশ ভালো লাগছে। গাড়ি-চড়া মেয়েগুলো সবসময় এত সুন্দর হয় কেন? তবে এই মেয়েটার গায়ের রঙ আরেকটু ফরসা হলে ভালো হত। চোখ অবশ্যি সুন্দর। এমনও হতে পারে, ভয় পাওয়ার জন্যে সুন্দর লাগছে। ভীত হরিণীর চোখ যেমন সুন্দর হয়, ভীত তরুণীর চোখও বোধহয় সুন্দর হয়। ভয় পেলেই হয়তোবা চোখ সুন্দর হয়ে যায়।

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, গাড়িতে খানিকটা ঘুরব। জাস্ট ইউনিভার্সিটি এলাকায় একটা চক্কর দিয়ে তারপর যাব ফার্মগেট।

কেউ কোনো কথা বলল না।

আমি বললাম, গাড়িতে কোনো গান শোনার ব্যবস্থা নেই? ড্রাইভার ক্যাসেট দাও তো।

ড্রাইভার ক্যাসেট চালু করে দিল। ভেবেছিলাম কোনো ইংরেজি গান বোধহয় বাজবে। তা না—নজরুল গীতি।

হায় মদিনাবাসী প্রেমে ধর হাত মম

ডক্টর অঞ্জলি ঘোষের গাওয়া। এই গানটা আমার পছন্দ, রূপাদের বাসায় শুনেছি। গানটায় আলাদা একধরনের মজা আছে। কেমন জানি কাওয়ালি কাওয়ালি ভাব।

গাড়ি আচমকা ব্রেক কষে থেমে গেল। আমি কিছু বুঝবার আগেই ড্রাইভার হুট করে নেমে গেল। তাকে যতটা নির্বোধ মনে করা হয়েছিল দেখা যাচ্ছে সে তত নির্বোধ নয়। সে গাড়ি থামিয়েছে মোটরসাইকেলে বসে-থাকা এক জন পুলিশ-সার্জেনের গা ঘেঁষে। চোখ বড় বড় করে কীসব বলছে। অঞ্জলি ঘোষের গানের কারণে তার কথা বোঝা যাচ্ছে না।

পুলিশ-সার্জেন্ট আমার জানালার কাছে এসে বলল, নামুন তো।

আমি নামলাম।

দেখি ব্যাগে কী আছে?

আমি দেখালাম।

একটা নোটবই। দুইটা বলপয়েন্ট, শিশ ভাঙা পেনসিল। পাঁচ টাকা দিয়ে কেনা এক প্যাকেট চিপস।

পুলিশ-সার্জেন্ট ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি এর বিরুদ্ধে কোনো ফরম্যাল কমপ্লেইন করতে চান?

ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়ের দিকে তাকালেন। মেয়েটি বলল, অবশ্যই চাই। আমি জাস্টিস এম. সোবাহান সাহেবের মেয়ে। এই লোক আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল। মাস্তানি করছিল।

আপনাদের কমপ্লেইন থানায় করতে হবে। রমনা থানায় চলে যান।

এখন তো যেতে পারব না। এখন আমরা একটা কাজে যাচ্ছি।

কাজ সেরে আসুন। আমি একে রমনা থানায় হ্যান্ডওভার করে দেব। আসামির নাম জানেন তো?

না।

পুলিশ-সার্জেন্ট আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই তোর নাম কী?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যে শুরুতে আমাকে আপনি বলছে, এখন সুন্দর একটা মেয়ের সামনে তুই করে বলছে!

এই তোর নাম বল।

আমি উদাস গলায় বললাম, আমার নাম টুটুল।

পুলিশ-সার্জেন্ট ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, ভুল নাম দিচ্ছে—যাই হোক এই নামেই বুকিং হবে। হারামজাদারা ইদানীং সেয়ানা হয়েছে, কিছুতেই কারেক্ট নাম বলবে না। ঠিকানা তো বলবেই না।

বিশাল কালো গাড়ি হুঁশ করে বের হয়ে গেল। ফার্মগেটে যাওয়া আমার বিশেষ দরকার—ইন্দিরা রোডে আমার বড়ফুপুর বাসায় দুপুরে খাওয়ার কথা। সেই খাওয়া মাথায় উঠল। সার্জেন্ট আমাকে ছাড়বে না। রমনা থানায় চালান করবে বলাই বাহুল্য। জাস্টিসের নাম শুনেছে। বড় কারোর নাম শুনলে এদের হুঁশ থাকে না।

আমি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে ফেললাম। হাজতে থাকতে হলে সঙ্গে সিগারেট থাকা ভালো। আমার ধারণা ছিল সার্জেন্ট তাঁর মোটরসাইকেলের পেছনে আমাকে বসিয়ে থানায় নিয়ে যাবে। তা করল না। আজকাল পুলিশ খুব আধুনিক হয়েছে। পকেট থেকে ওয়াকিটকি বের করে কী বলতেই পুলিশের জিপ এসে উপস্থিত। অবিকল হিন্দি মুভি।

সম্পূর্ণ নিজের বোকামিতে দাওয়াত খাবার বদলে থানায় যাচ্ছি। মেজাজ খারাপ হওয়ার কথা। আশ্চর্যের ব্যাপার খারাপ হচ্ছে না। বরং মজা লাগছে। অঞ্জলি ঘোষের গানের পুরোটা শোনা হলো না এইজন্যে অবশ্যি একটু আফসোস হচ্ছে। 'হায় মদিনাবাসী' বলে চমৎকার টান দিচ্ছিল।

থানার ওসি সাহেবের চেহারা বেশ ভালো।

মেজাজও বেশ ভালো। চেইন স্মোকার। ক্রমাগত বেনসন অ্যান্ড হেজেস টেনে যাচ্ছে। বাজারে এখন সত্তর টাকা করে প্যাকেট যাচ্ছে। দিনে তিন প্যাকেট করে হলে মাসে কত হয়? দুশো দশ গুণন তিরিশ। ছ হাজার ত্রিশ। একজন ওসি সাহেব বেতন পান কত, একফাঁকে জেনে নিতে হবে।

ওসি সাহেব শুরুতে প্রশ্ন করেন ভাববাচ্যে। শুরুর কয়েকটি প্রশ্নে জেনে নিতে চেষ্টা করেন আসামি কোন্ সামাজিক অবস্থায় আছে। তার ওপর নির্ভর করে আপনি, তুমি বা তুই ব্যবহৃত হয়।

ওসি সাহেব বললেন, কী নাম?

চৌধুরী খালেকুজ্জামান। ডাকনাম টুটুল।

কী করা হয়?

সাংবাদিকতা করি।

কোন্ পত্রিকায়?

বিশেষ কোনো পত্রিকার সঙ্গে জড়িত নই। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা। যেখানে সুযোগ পাই ঢুকে পড়ি। টুটুল চৌধুরী এই নামে লেখা ছাপা হয়। হয়তো আপনার চোখে পড়েছে। পুলিশের উপর একটা ফিচার করেছিলাম।

কী ফিচার?

ফিচারের শিরোনাম হচ্ছে—একজন পুলিশ-সার্জেন্টের দিন-রাত্রি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁকে কী করতে হয় তাই ছিল বিষয়। অবশ্যি একফাঁকে খুব ড্যামেজিং কয়েকটা লাইন ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

যেমন?

বলেছিলাম এই পুলিশ-সার্জেন্ট তাঁর একটি কর্মমুখর দিনে তিন প্যাকেট বেনসন অ্যান্ড হেজেজ পান করেন। তিনি জানিয়েছেন টেনশন দূর করতে এটা তাঁর প্রয়োজন। অবশ্যই তিনি খুব টেনশানের জীবন যাপন করেন। এই বাজারে দিনে তিন প্যাকেট করে বেনসন খেলে মাসে দুই হাজার তিনশো টাকা প্রয়োজন। আমাদের জিজ্ঞাস্য তাঁর বেতন কত?

ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন। আমি হাসিমুখে বললাম, তবে শেষের লাইন তিনটা ছাপা হয় নি। এডিটর সাহেব কেটে দিয়েছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে কেউ কিছু ছাপাতে চায় না।

ওসি সাহেব শুকনো গলায় বললেন, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যাক আপনি করে বলছে। সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়া গেল। এখন চাইলে এক কাপ চাও চলে আসতে পারে। পুলিশরা উঁচুদরের আসামিদের ভালো খাতির করে। চা সিগারেট খাওয়ায়।

আপনি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী?

অভিযোগ যে কী তা আমি নিজেই জানি না। ওরা অভিযোগ করলে তারপর জানা যাবে। নারী অপহরণের অভিযোগ হতে পারে।

নারী অপহরণ?

জি। জাস্টিস সাহেবের স্ত্রী এবং কন্যাকে নিয়ে ওদের গাড়িতেই পালাতে চেষ্টা করছিলাম। মাছের তেলে মাছ ভাজা বলতে পারেন।

ওসি সাহেব থমথমে গলায় বললেন, আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করছেন? দয়া করে করবেন না। আমি আপনার চেয়েও বেশি রসিক, কাজেই অসুবিধা হবে।

জি আচ্ছা রসিকতা করব না।

আপনি কোনার দিকের ঐ বেঞ্চিতে বসে থাকুন।

হাজতে পাঠাচ্ছেন না?

ফাইনাল অভিযোগ আসুক তারপর পাঠাব। হাজত তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

এক কাপ চা কি পেতে পারি?

ওসি সাহেব গম্ভীরমুখে আমার ব্যাগের জিনিসপত্র দেখতে লাগলেন। নোটবইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। আমি বললাম, ওটা আমার কবিতার খাতা। মাঝেমধ্যে কবিতা লিখি।

তাঁর মুখের কাঠিন্য তাতে একটুও কমল না। কবি শুনে মেয়েরা খানিকটা দ্রবীভূত হয়। পুলিশ কখনো হয় না। পুলিশের সঙ্গে কবিতার নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোনো বিরোধ আছে।

চুপচাপ বসে থাকা অনেকের জন্যেই খুব কষ্টকর। আমার জন্যে ডাল-ভাত। শুধু হেলান দেবার একটু জায়গা পেলে আরাম করে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারি। বেঞ্চিতে হেলান দেয়ার ব্যবস্থা থাকে না বলে একটু অসুবিধা হচ্ছে, তবে সেই অসুবিধাও অসহনীয় নয়। এই রকম পরিস্থিতিতে আমি আমার নদীটা বের করে ফেলি। তখন অসুবিধা হয় না।

নদী বের করার ব্যাপারটা সম্ভবত আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয় নি। একটু ব্যাখ্যা করলেই পরিষ্কার হবে।

ছোটবেলার কথা। ক্লাস সিক্সে পড়ি। জিওগ্রাফি পড়ান মফিজ স্যার। তিনি ক্লাসে ঢুকলে চেয়ার-টেবিলগুলো পর্যন্ত ভয়ে কাঁপে। স্যার মানুষটা ছোটখাটো, কিন্তু হাতের থাবাটা বিশাল। আমাদের ধারণা ছাত্রদের গালে চড় বসাবার জন্যে আল্লাহতালা স্পেশালভাবে স্যারের এই হাত তৈরি করে দিয়েছেন। স্যারের চড়েরও নানান নাম ছিল—রাম চড়, শ্যাম চড়, যদু চড়, মধু চড়। এর মধ্যে সবচে কঠিন চড় হচ্ছে রাম চড়, সবচে নরমটা হচ্ছে মধু চড়।

স্যার সেদিন পড়াচ্ছেন—বাংলাদেশের নদ-নদী। ক্লাসে ঢুকেই আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, এই একটা নদীর নাম বল তো। চট করে বল।

মফিজ স্যার কোনো প্রশ্ন করলে কিছুক্ষণের জন্যে আমার মাথাটা পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে যায়। কান ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। মনে হয় মাথার খুলির ভেতর জমে থাকা কিছু বাতাস কানের পরদা ফাটিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে।

কী ব্যাপার চুপ করে আছিস কেন? নাম বল।

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, আড়িয়াল খাঁ।

স্যার এগিয়ে এসে প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলেন। খুব সম্ভব রাম চড়। হুংকার

দিয়ে বললেন, এত সুন্দর সুন্দর নাম থাকতে তোর মনে এল আড়িয়াল খাঁ? সবসময় ফাজলামি? কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাক।

আমি কানে ধরে সারাটা ক্লাস দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘন্টা পড়ার মিনিট পাঁচেক আগে পড়ানো শেষ করে স্যার চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাছে আয়।

আরেকটি চড় খাবার জন্যে আমি ভয়ে ভয়ে স্যারের কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি বিষণ্ণ গলায় বললেন, এখনো কানে ধরে আছিস কেন? হাত নামা।

আমি হাত নামালাম। স্যার ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, তোকে শাস্তি দেয়াটা অন্যায় হয়েছে, খুবই অন্যায়। তোকে নদীর নাম বলতে বলেছি, তুই বলেছিস। আয় আরো কাছে আয়, তোকে আদর করে দেই।

স্যার এমন ভঙ্গিতে মাথায় এবং পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন যে আমার চোখে পানি এসে গেল। স্যার বিব্রত গলায় বললেন, আমি তোর কাছে থেকে সুন্দর একটা নদীর নাম শুনতে চেয়েছিলাম আর তুই বললি আড়িয়াল খাঁ। আমার মেজাজটা গেল খারাপ হয়ে। আচ্ছা এখন সুন্দর একটা নদীর নাম বল।

আমি শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে বললাম, ময়ূরাক্ষী।

ময়ূরাক্ষী? এই নাম তো শুনিনি। কোথাকার নদী?

জানি না স্যার।

এই নামে আসলেই কি কোনো নদী আছে?

তাও জানি না স্যার।

স্যার হালকা গলায় বললেন, আচ্ছা থাক। না থাকলে নেই। এটা হচ্ছে তোর নদী। যা জায়গায় গিয়ে বোস। এমনিতেই তোকে শাস্তি দিয়ে আমার মনটা খারাপ হয়েছে। তুই তো দেখি কেঁদে কেঁদে আমার মনখারাপটা বাড়াচ্ছিস। আর কাঁদিস না।

এই ঘটনার প্রায় বছর-তিন পর ক্যান্সারে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মফিজ স্যার মারা যান। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে স্যারকে দেখতে গিয়েছি। নোংরা একটা ঘরের নোংরা বিছানায় স্যার শুয়ে আছেন। মানুষ না—যেন কফিন থেকে বের-করা মিশরের মমী। স্যার আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। উঁচুগলায় তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন, ওগো এই ছেলেটাকে দেখে যাও। এই ছেলের একটা নদী আছে। নদীর নাম ময়ূরাক্ষী।

স্যারের স্ত্রী আমার প্রতি কোনোরকম আগ্রহ দেখালেন না। মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। স্যার সেই অনাদর পুষিয়ে দিলেন। দুর্বল হাতে টেনে তাঁর পাশে বসালেন। বললেন, তোর নদীটা কেমন বল তো?

আমি নিচুগলায় বললাম, আমি স্যার কিছু জানি না। দেখিনি কখনো।

তবু বল শুনি। বানিয়ে বানিয়ে বল।

আমি লাজুক গলায় বললাম, নদীটা খুব সুন্দর।

আরে গাধা নদী তো সুন্দর হবেই। অসুন্দর নদী বলে কিছু নেই। আরো কিছু বল।

আমি বলার মতো কিছু পেলাম না। চুপচাপ বসে রইলাম।

স্যার যেদিন মারা যান সেই রাত্রিতেই আমি প্রথম ময়ূরাক্ষী নদীটা স্বপ্নে দেখি। ছোট্ট একটা নদী। তার পানি কাঁচের মতো স্বচ্ছ। নিচের বালিগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। নদীর দুইধারে দূর্বাঘাসগুলো কী সবুজ! কী কোমল! নদীর ঐ পাড়ে বিশাল ছায়াময় একটা পাকুড় গাছ। সেই গাছে বিষণ্ন গলায় একটা ঘুঘু ডাকছে। সেই ডাকে একধরনের কান্না মিশে আছে।

নদীর ধার ঘেঁষে পানি ছিটাতে ছিটাতে ডোরাকাটা সবুজ শাড়ি-পরা একটি মেয়ে ছুটে যাচ্ছে। আমি শুধু একঝলক তার মুখটা দেখতে পেলাম। স্বপ্নের মধ্যেই তাকে খুব চেনা, খুব আপন মনে হলো। যেন কত দীর্ঘ শতাব্দী এই মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়েছি।

ময়ূরাক্ষী নদীকে একবারই আমি স্বপ্নে দেখি। নদীটা আমার মনের ভেতর পুরোপুরি গাঁথা হয়ে যায়। এরপরঁ অবাক হয়ে লক্ষ্য করি কোথাও বসে একটু চেষ্টা করলেই নদীটা আমি দেখতে পাই। তারজন্যে আমাকে কোনো কষ্ট করতে হয় না। চোখ বন্ধ করতে হয় না, কিছু না। একবার নদীটা বের করে আনতে পারলে সময় কাটানো কোনো সমস্যা নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি নদীর তীরে হাঁটি। নদীর হিম শীতল জলে পা ডুবিয়ে বসি। শরীর জুড়িয়ে যায়। ঘুঘুর ডাকে চোখ ভিজে ওঠে।

ঘুমুচ্ছেন নাকি?

আমি চোখ মেললাম। চারদিকে অন্ধকার। আরে সর্বনাশ, এতক্ষণ পার করেছি! ওসি সাহেব বললেন, যান চলে যান। জাস্টিস সাহেবের বাসা থেকে টেলিফোন করেছিল। ওরা কোনো চার্জ আনবে না। You are free to go.

জাস্টিস সাহেব নিজেই টেলিফোন করেছিলেন?

না, তাঁর মেয়ে।

মেয়েটা কী বলল, দয়া করে বলবেন?

বলল ধমকধামক দিয়ে ছেড়ে দিতে।

তাহলে দয়া করে ধমকধামক দিন। তারপর যাই।

ওসি সাহেব হেসে ফেললেন। পুলিশের যে একেবারেই রসবোধ নেই সেটা ঠিক না। আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, মেয়েটা কি তার নাম আপনাকে বলেছে?

হ্যাঁ বলেছে, মীরা কিংবা মীরু এই জাতীয় কিছু।

আপনি কি নিশ্চিত যে সে জাস্টিস এম. সোবাহান সাহেবের মেয়ে? অন্য কেউও তো হতে পারে। আপনি একটা উড়ো টেলিফোন কল পেয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেন তারপর জাস্টিস সাহেব ধরবেন আপনাকে, আইনের প্যাঁচে ফেলে অবস্থা কাহিল করে দেবেন।

ভাই আপনি যান তো। আর শুনেন একটা উপদেশ দেই। পুলিশের সঙ্গে এত মিথ্যাকথা বলবেন না। মিথ্যা বলবেন ভালোমানুষদের কাছে। যা বলবেন তারা তাই বিশ্বাস করবে। পুলিশ কোনোকিছুই বিশ্বাস করে না। খোঁজখবর করে।

আপনি আমার সম্পর্কে খোঁজখবর করেছেন?

হ্যাঁ। সংবাদপত্রের অফিসগুলোতে খোঁজ নিয়েছি। জেনেছি টুটুল চৌধুরী নামের কোনো ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক নেই।

আপনি কি আমার মুচলেকা ফুচলেকা এইসব কিছু নেবেন না?

না। এখন দয়া করে বিদেয় হোন।

আপনার গাড়ি করে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। আমি কি আশা করতে পারি না আবার গাড়ি করে নামিয়ে দিয়ে আসবেন।

কোথায় যাবেন?

ফার্মগেট।

চলুন নামিয়ে দেব।

আমি হাসিমুখে বললাম, আপনার এই ভদ্রতার কারণে কোনো একদিন হয়তো আমি আপনাকে ময়ূরাক্ষীর তীরে নিমন্ত্রণ করব।

ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি কী বললেন বুঝতে পারলাম না।

ঐটা বাদ দিন। সবকিছু বুঝে ফেললে তো মুশকিল। ভালো কথা, আপনি ডেইলি ক-প্যাকেট সিগারেট খান তা কি জানতে পারি?

ওসি সাহেব বললেন, আপনি লোকটা তো ভালো ত্যাঁদড় আছেন। দুই থেকে আড়াই প্যাকেট লাগে।

২

বড়ফুপুর বাসায় দুপুরে যাবার কথা।

উপস্থিত হলাম রাত আটটায়। কেউ আবার হলো না। ফুপুর বড়ছেলে বাদল

আমাকে দেখে উল্লসিত গলায় বলল, হিমুদা এসেছ? থ্যাংকস। অনেক কথা আছে, আজ থাকবে কিন্তু। আই নিড ইওর হেল্প।

বাদল এবার ইন্টারমিডিয়েট দেবে। এর আগেও তিনবার দিয়েছে। সে পড়াশোনায় খুবই ভালো। এসএসসি'তে বেশ কয়েকটা লেটার এবং স্টার মার্ক পেয়েছে। সমস্যা হয়েছে ইন্টারমিডিয়েটে। পরীক্ষা শেষপর্যন্ত দিতে পারে না। মাঝামাঝি জায়গায় তার একধরনের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যায়। তার কাছে মনে হয় পরীক্ষার হল হঠাৎ ছোট হতে শুরু করে। ঘরটা ছোট হয়। পরীক্ষার্থীরাও ছোট হয়। চেয়ার টেবিল সব ছোট হতে থাকে। তখন সে ভয়ে চিৎকার দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। বাইরে আসা মাত্রই দেখে সব স্বাভাবিক। তখন সে আর পরীক্ষার হলে ঢোকে না। চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি চলে আসে।

দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেবার সময় অনেক ডাক্তার দেখানো হলো। ওষুধপত্র খাওয়ানো হলো। সেবারও একই অবস্থা। এখন আবার পরীক্ষা দেবে। এবারে ডাক্তারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পীর ফকির। বাদলের গলায়, হাতে, কোমরে নানান মাপের তাবিজ ঝুলছে। এর মধ্যে একটা তাবিজ নাকি জ্বিনকে দিয়ে কোহকাফ নগর থেকে আনানো। কোহকাফ নগরীতে নাকি জ্বিন এবং পরীরা থাকে। আমার বড়ফুপা ঘোর নাস্তিক ধরনের মানুষ এবং বেশ ভালো ডাক্তার—তিনিও কিছু বলছেন না।

বাদলেরও দেখি আমার মতো অবস্থা। দাড়িগোঁফ গজিয়ে হুলুস্থুল। লম্বা লম্বা চুল। সে খুশিখুশি গলায় বলল, হিমুদা পড়াশোনা করছি। খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমার ঘরে চলে আসবে।

পড়াশোনা হচ্ছে কেমন?

হেভি হচ্ছে। একই জিনিস তিন-চার বছর ধরে পড়ছি তো, একেবারে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। হিমু ভাই, তুমি এমন ডার্ক হলুদ কোথায় পেলে?

গাউছিয়ায়।

ফাইন দেখাচ্ছে। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী লাগছে—সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, মথুরাপুরীর প্রাচীরের নিচে একদা ছিলেন সুপ্ত।

যা পড়াশোনা কর। আমি আসছি।

কী আর পড়াশোনা করব। সব তো ভাজা ভাজা।

তবু আরেকবার ভেজে ফেল। কড়া ভাজা হবে।

বাদল শব্দ করে হেসে উঠল। সেই হাসি হেঁচকির মতো চলতেই থাকল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এই ছেলের অবস্থা দেখি দিনদিন খারাপ হচ্ছে। এতক্ষণ ধরে কেউ হাসে?

ফুপু গম্ভীরমুখে খাবার এগিয়ে দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে দুপুরে প্রচুর আয়োজন

ছিল। সেইসব গরম করে দেয়া হচ্ছে। পোলাওয়ে টক টক গন্ধ। নষ্ট হয়ে গেছে কিনা কে জানে? আমার পেটে অবশ্যি সবই হজম হয়ে যায়। পোলাওটা মনে হচ্ছে হবে না। কষ্ট দেবে।

ফুপু বললেন, রোস্ট আরেক পিস দেব?

দাও।

এত খাবারদাবারের আয়োজন কীজন্যে একবার জিজ্ঞেস করলি না?

আমি খাওয়া বন্ধ করে বললাম, কীজন্যে?

আত্মীয়স্বজন যখন কোনো উপলক্ষে খেতে ডাকে তখন জিজ্ঞেস করতে হয় উপলক্ষটা কী। যখন আসতে বলে তখন আসতে হয়।

একটা ঝামেলায় আটকে পড়েছিলাম। উপলক্ষটা কী?

রিনকির বিয়ের কথা পাকা হলো।

বাহ্ ভালো তো।

ফুপু গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি খেয়েই যাচ্ছি। টকগন্ধ পোলাও এত খাওয়া ঠিক হচ্ছে না সেটাও বুঝতে পারছি তবু নিজেকে সামলাতে পারছি না। যা হবার হবে। ফুপু শীতল গলায় বললেন, একবার তো জিজ্ঞেস করলি না কার সঙ্গে বিয়ে। কী সমাচার।

তোমরা নিশ্চয় দেখেশুনে ভালো বিয়েই দিচ্ছ।

তুই একবার জিজ্ঞেস করবি না। তোর কোনো কৌতূহলও নেই?

আরে কী বল কৌতূহল নেই। আসলে এত ক্ষুধার্ত যে কোনোদিকে মন দিতে পারছি না। দুপুরের খাওয়া হয় নি। ছেলে করে কী?

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার।

বল কী! তাহলে তো মালদার পার্টি।

ফুপু রাগী-গলায় বললেন, ছোটলোকের মতো কথা বলবি নাতো, মালদার পার্টি আবার কী?

পয়সাওয়ালা পার্টি এই বলছি।

হ্যাঁ, টাকা-পয়সা ভালোই আছে।

শর্ট না তো? আমার কেন জানি মনে হত—একটা শর্ট টাইপের ছেলের সাথে রিনকির বিয়ে হবে। ছেলের হাইট কত?

ফুপুর মুখটা কালো হয়ে গেল। তিনি নিচুগলায় বললেন, হাইট একটু কম। উঁচু জুতা পরলে বোঝা যায় না।

বোঝা না-গেলে তো কোনো সমস্যাই নেই। তাছাড়া বেঁটে লোক খুব ইন্টেলিজেন্ট হয়। যত লম্বা হয় বুদ্ধি তত কমতে থাকে। আমি এখন পর্যন্ত কোনো

বুদ্ধিমান লম্বা মানুষ দেখি নি। সত্যি বলছি।

ফুপুর মুখ আরো অন্ধকার হয়ে গেল। তখন মনে পড়ল—কী সর্বনাশ! ফুপা নিজেই বিরাট লম্বা, প্রায় ছ ফুট। আজ দেখি একের পর এক ঝামেলা বাঁধিয়ে যাচ্ছি।

তুই যাবার আগে তোর ফুপার সঙ্গে কথা বলে যাবি। তোর সঙ্গে নাকি কী জরুরি কথা আছে।

নো প্রোবলেম।

আর রিনকির সঙ্গে কথা বলার সময় জামাই লম্বা কি বেঁটে এ জাতীয় কোনো কথাই বলবি না।

বেঁটে লোকরা যে জ্ঞানী হয় এই কথাটা ঠিক কায়দা করে বলব?

তোর কিছুই বলার দরকার নেই।

ঠিক আছে। ঠাণ্ডা পেপসি টেপসি থাকলে দাও। তোমরা তো কেউ পান খাও না। কাউকে দিয়ে তিনটা পান আনাও তো।

রিনকির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। এই মেয়ে নাইন-টেনে পড়ার সময় রোগাভোগা ছিল—এখন দিনদিন মোটা হচ্ছে। আজ অবশ্যি সে রকম মোটা লাগছে না। ভালোই লাগছে। মনে হচ্ছে এর চেয়ে কম মোটা হলে তাকে মানাত না।

কি রে, ক্লাস ওয়ান একটা বর জোগাড় করে ফেললি? কনগ্রাচুলেশনস।

রিনকি অসম্ভব খুশি হলো। অবশ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট উল্টে বলল, ক্লাস ওয়ান বর না ছাই। ক্লাস থ্রি হবে বড় জোর।

মেয়েদের আমি কখনও খুশি হলে সেই খুশি প্রকাশ করতে দেখি নি। একবার একটা মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল। সে ইন্টারমিডিয়েটে ছেলে-মেয়ে সবার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। আমি বললাম, কি খুশি তো? সে ঠোঁট উল্টে বলল, উহুঁ বাংলা সেকেন্ড পেপারে যা পুওর নাম্বার পেয়েছি। জানেন, মার্কশিট দেখে কেঁদেছি। রিনকিরও দেখি সেই অবস্থা। খুশিতে মুখ ঝলমল করছে অথচ মুখে বলছে—ক্লাস থ্রি।

হিমু ভাই, ও কিন্তু দারুণ শর্ট। মনে হয় কলিংবেল হাত দিয়ে নাগাল পাবে না।

আমি অত্যন্ত খুশি হবার ভঙ্গি করলাম। খুশিগলায় বললাম, তাহলে তো তুই লাকি। ভাগ্যবতী মেয়েদের বর খাটো হয়– খনার বচনে আছে।

যাও।

সত্যি—খনা বলছেন : খাটো পেয়ারা ভালো। খাটো স্বামীর মন....তারপর আরো কী কী যেন আছে মনে নেই।

বানিয়ে বানিয়ে কী যে মিথ্যে তুমি বল। এই ছড়াটা তুমি এক্ষুণি বানালে তাই না?

হুঁ।

কেন বানালে বল তো?

তোকে খুশি করবার জন্যে।

খুশি করবার দরকার নেই, আমি এমনিতেই খুশি।

সেটা তোর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। বর পছন্দ হয়েছে?

হুঁ। তবে খুব বিরক্ত করছে।

বিরক্ত করছে মানে?

আজই মাত্র কথাবার্তা ফাইনাল হলো এর মধ্যে তিনবার টেলিফোন করেছে। তারপর বলেছে রাত এগারটার সময় আবার করবে। লজ্জা লাগে না? তার উপর টেলিফোন বাবার ঘরে। বাবা সন্ধে থেকে তাঁর ঘরে বসা আছে। আমি কি বাবার সামনে তার সঙ্গে কথা বলব?

লম্বা তার আছে, তুই টেলিফোন তোর ঘরে নিয়ে আয়।

আমি কী করে আনব? আমার লজ্জা লাগে না?

আচ্ছা যা, আমি এনে দিচ্ছি।

পরে কিন্তু তুমি এই নিয়ে ঠাট্টা করতে পারবে না। আমি তোমাকে আনতে বলিনি। তুমি নিজ থেকে আনতে চেয়েছ।

তাতো বটেই। ঐ ভদ্রলোক টেলিফোনে কী বলে?

কী আর বলবে, কিছু বলে না।

আহা বল না শুনি।

উফ তুমি বড় যন্ত্রণা কর—আমি কিছু বলতে টলতে পারব না।

রিনকি লজ্জায় লাল-নীল হতে লাগল। মনে হচ্ছে সে এখন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটাচ্ছে। বড় ভালো লাগছে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে। রিনকির সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ থাকার ইচ্ছা ছিল। থাকা গেল না। ফুপা ডেকে পাঠালেন।

ফুপার ঘর অন্ধকার।

জিরো পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। লক্ষণ সুবিধার না। ফুপার মাঝেমধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস আছে। এই কাজটা বেশিরভাগ সময় বাইরেই সারেন। বাসায় ফুপুর জন্যে তেমন সুযোগ পান না। ফুপুর শাসন বেশ কঠিন। হঠাৎ হঠাৎ কোনো বিশেষ উপলক্ষে বাসায় মদ্যপানের অনুমতি পান। আজ পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

মদ্যপান করছে এ রকম মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলতে হয়। কারণ তাদের মুড মদের পরিমাণ এবং কতক্ষণ ধরে মদ্যপান করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে। ফুপার তরল অবস্থায় তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা বিশেষ হয় নি, কাজেই তরল অবস্থায় তাঁর মেজাজ-মর্জি কেমন থাকে তাও জানি না।

ফুপা আসব?

হিমু? এসো। দরজা ভিড়িয়ে দাও। তোমার সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। বস সামনের চেয়ারটায় বস।

আমি বসলাম।

তিনি গ্লাস দেখিয়ে বললেন, আশা করি এইসব ব্যাপারে তোমার কোনো প্রিজুডিস নেই।

জি না।

তারপর বল কেমন আছ। ভালো?

জি।

রিনকির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল শুনেছ বোধহয়?

জি।

ছেলে ভালো তবে খুবই খাটো। আমাদের সঙ্গে এই রকম একটা ছেলে পড়ত—তার নাম ছিল স্ক্রু। এই ছেলেরও নিশ্চয়ই এই ধরনের কোনো নামটাম আছে। বেঁটে ছেলের নাম সাধারণত স্ক্রু হয় কিংবা বল্টু হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। ফুপাকে নেশায় ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। না ধরলে নিজের জামাই সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলতে পারতেন না।

আপনার ছেলে পছন্দ হয় নি?

আরে পছন্দ হবে কী? মার্বেলের সাইজের এক ছেলে।

পছন্দ হয় নি তো বিয়েতে মত দিলেন কেন?

আমার মতামতের প্রশ্নই তো ওঠে না। আমি হচ্ছি এই সংসারের টাকা বানানোর মেশিন। এর বেশি কিছু না। আমি কী বলছি না বলছি তা কেউ জানতে চায় না। তারপরেও বলতাম। কিন্তু দেখি মেয়ে এবং মেয়ের মা দুই জনই খুশিতে বাকবাকুম।

তাঁর গ্লাস খালি হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরো খানিকটা ঢাললেন। আমি তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, এটা পঞ্চম পেগ। আমার লিমিট হচ্ছে সাত। সাতের পর লজিক এলোমেলো হয়ে যায়। সাতের আগে কিছুই হয় না।

আমি বললাম, ফুপা এক মিনিট। আমি টেলিফোনটা রিনকির ঘরে দিয়ে আসি। ও কোথায় যেন টেলিফোন করবে।

ফুপা মুখ বিকৃত করে বললেন, কোথায় করবে বুঝতে পারছ না? ঐ মার্বেলের কাছে করবে। টেলিফোন করে করে অস্থির করে তুলল।

আমি রিনকিকে টেলিফোন দিয়ে এসে বললাম, আপনি কী জানি জরুরি কথা বলবেন।

ও হ্যাঁ জরুরি কথা, বাদল সম্পর্কে।

জি বলুন।

ও তোমাকে কেমন অনুকরণ করে সেটা লক্ষ্য করেছ? তুমি তোমার মুখে দাড়িগোঁফর চাষ করছ—কর। সেও তোমার পথ ধরেছে। আজ তুমি হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে এসেছ, আমি এক হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি, কাল দুপুরের মধ্যে সে হলুদ পাঞ্জাবি কিনবে। আমি কি ভুল বললাম?

না, ভুল বলেন নি।

তুমি যদি আজ মাথা কামও, আমি সিওর ব্যাটা কাল মাথা কামিয়ে ফেলবে। এ রকম প্রভাব তুমি কী করে ফেললে এটা তুমি আমাকে বল। You better explain it.

আমার জানা নেই ফুপা।

ভুলটা আমার। মেট্রিক পাস করে তুমি যখন এলে আমি ভালোমনে বললাম, আচ্ছা থাকুক। মা-বাপ নেই ছেলে—একটা আশ্রয় পাক। তুমি-যে এই সর্বনাশ করবে তাতো বুঝি নি! বুঝতে পারলে তখনই ঘাড় ধরে বের করে দিতাম।

আমি জেনেশুনে কিছু করি নি।

তাও ঠিক। জেনেশুনে তুমি কিছু কর নি। আই ডু এগ্রি। তোমার লাইফস্টাইল তাকে আকর্ষণ করেছে। তুমি ভ্যাগাবন্ড না অথচ তুমি ভাব কর যে তুমি ভ্যাগাবন্ড। জোছনা দেখানোর জন্যে চন্দ্রায় এক জঙ্গলের মধ্যে বাদলকে নিয়ে গেলে। সারারাত ফেরার নাম নেই। জোছনা এমন কী জিনিস জঙ্গলে বসে দেখতে হবে? বল তুমি। তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

শহরের আলোয় জোছনা ঠিক বোঝা যায় না।

মানলাম তোমার কথা। ভালো কথা, চন্দ্রায় গিয়ে জোছনা দেখ। তাই বলে সারারাত বসে থাকতে হবে?

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জোছনা কীভাবে বদলে যায় সেটাও একটা দেখার মতো ব্যাপার। শেষরাতে পরিবেশ ভৌতিক হয়ে যায়।

তাই নাকি?

জি। তাছাড়া জঙ্গলের একটা আলাদা এফেক্ট আছে। শেষরাতের দিকে গাছগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে।

তোমার কথা বুঝলাম না। গাছগুলো জীবন্ত হয় মানে? গাছ তো সবসময়ই জীবন্ত।

জি-না। ওরা জীবন্ত, তবে সুপ্ত। খানিকটা জেগে ওঠে পূর্ণিমারাতে। তাও মধ্য-রাতের পর থেকে। জঙ্গলে না-গেলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। আপনি একবার চলুন-না নিজের চোখে দেখবেন। দিন-তিনেক পরেই পূর্ণিমা।

দিন-তিনেক পরেই পূর্ণিমা?

জি।

এইসব হিসাব-নিকাশ সবসময় তোমার কাছে থাকে?

জি।

একবার গেলে হয়।

বলেই ফুপা গম্ভীর হয়ে গেলেন। চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে রইলেন। তারপর বললেন, তুমি আমাকে পর্যন্ত কনভিন্সড করে ফেলেছিলে। মনে হচ্ছিল তোমার সঙ্গে যাওয়া যেতে পারে। অবশ্যি এটা সম্ভব হয়েছে নেশার ঘোরে থাকার জন্যে।

তা ঠিক। কিছু মানুষ ধরেই নিয়েছে তারা যা ভাবছে তাই ঠিক। তাদের জগৎটাই একমাত্র সত্যি জগৎ। এরা রহস্য খুঁজবে না। এরা স্বপ্ন দেখবে না।

চুপ কর তো।

আমি চুপ করলাম।

ফুপা রাগী-গলায় বললেন, তুমি ভ্যাগাবন্ডের মতো ঘুরবে আর ভাববে বিরাট কাজ করে ফেলছ। তুমি যে অসুস্থ এটা তুমি জানো? ডাক্তার হিসেবে বলছি— তুমি অসুস্থ। You are a sick man.

ফুপা আপনি নিজেও কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বেশি খাচ্ছেন। আপনি বলছেন আপনার লিমিট সাত। আমার ধারণা এখন নয় চলছে।

তোমার কাছে সিগারেট আছে?

আছে।

দাও।

তিনি সিগারেট ধরালেন। খুকখুক করে কাশলেন। ফুপাকে আমি কখনো সিগারেট খেতে দেখি নি। তবে মদ্যপানের সঙ্গে সিগারেটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এ রকম শুনেছি।

হিমু।

জি।

রাস্তায় রাস্তায় ভ্যাগাবন্ডের মতো ঘুরে তুমি যদি আনন্দ পাও—তুমি অবশ্যি

তা করতে পার। It is your life. কিন্তু আমার ছেলেও তাই করবে তাতো হয় না।

ও কি তা করছে নাকি?

এখনো শুরু করে নি। তবে করবে। দুই বছর তুমি ওর সঙ্গে ছিলে। একই ঘরে ঘুমিয়েছ। এই দুই বছরে তুমি ওর মাথাটা খেয়েছ। তুমি আর এ বাড়িতে আসবে না।

জি আচ্ছা। আসব না।

এ বাড়ির ছায়া তুমি মাড়াবে না।

ঠিক আছে।

এই বাড়ির ত্রিসীমানায় যদি তোমাকে দেখি তাহলে পিটিয়ে তোমার পিঠের ছাল তুলে ফেলব।

আপনার নেশা হয়ে গেছে ফুপা। পিটিয়ে ছাল তোলা যায় না। আপনার লজিক এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ফুপার সিগারেট নিভে গেছে। সিগারেটে অনভ্যস্ত লোকজন সিগারেটে আগুন বেশিক্ষণ ধরিয়ে রাখতে পারে না। আমি আবার তার সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। ফুপা বললেন, তোমাকে আমি একটা প্রপোজাল দিতে চাই। একসেপ্ট করবে কি করবে না ভেবে দেখ।

কী প্রপোজাল?

তোমাকে একটি চাকরি জোগাড় করে দিতে চাই। As a matter of fact আমার হাতে একটা চাকরি আছে। আহামরি কিছু না। তবে তোমার চলে যাবে?

বেতন কত?

ঠিক জানি না। তিন হাজারের কম হবে না। বেশিও হতে পারে।

তেমন সুবিধার চাকরি বলে তো মনে হচ্ছে না।

ভিক্ষা করে জীবন যাপন করার চেয়ে কি ভালো না?

না। ভিক্ষা করে বেঁচে থাকার আলাদা আনন্দ আছে। প্রাচীন ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীদের সবাই ভিক্ষা করতেন। বাউল সম্প্রদায়ের সাধনার একটা বড় অঙ্গ হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি। এরা অবশ্যি ভিক্ষা বলে না। এরা বলে মাধুকরী।

আমার কাছে লেকচার ঝাড়বে না।

ফুপা আমি কি তাহলে উঠব?

যাও ওঠ। শুধু একটা জিনিস বল—যে ধরনের জীবন তুমি যাপন করছ তাতে আনন্দটা কী?

যা ইচ্ছা করতে পারার একটা আনন্দ আছে না?

যা ইচ্ছা তুমি কি তাই করতে পারবে?

অবশ্যই পারব। বলুন কী করতে হবে।

খুন করতে পারবে?

কেন পারব না! খুন করা আসলে খুব সহজ ব্যাপার।

সহজ ব্যাপার?

অবশ্যিই সহজ ব্যাপার। যে কেউ করতে পারে। রোজ কতগুলো খুন হচ্ছে দেখছেন না! খবরের কাগজ খুললেই দেখবেন। আমার তো রোজই একটা-দুটা মানুষকে খুন করতে ইচ্ছা করে।

হিমু। You are sick man. You are a sick man.

আর খাবেন না ফুপা। আপনি মাতাল হয়ে গেছেন।

কী করে বুঝলে মাতাল হয়ে গেছি। কী করে বুঝলে?

মাতালরা প্রতিটি বাক্য দুইবার করে বলে। আপনিও তাই বলছেন। আপনি বাথরুমে গিয়ে বমির চেষ্টা করুন। বমি করলে ভালো লাগবে।

বলেই আমি চেয়ার ছেড়ে সরে গেলাম। বমির কথা মনে করিয়ে দিয়েছি, কাজেই ফুপা এখন হড়হড় করে বমি করবেন। হলোও তাই। তিনি চারদিক ভাসিয়ে দিলেন। ওয়াক ওয়াক শব্দে ফুপু ছুটে এলেন। তিনি তাঁর সাজানো ঘরের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত। ফুপাকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছে। হঠাৎ হয়তো দেখব বমির সঙ্গে তাঁর পাকস্থলী বের হয়ে আসছে। সেই দৃশ্য খুব সুখকর হবে না। আমি বারান্দায় চলে এলাম। রিনকি ছুটে এসেছে, বাদলও এসেছে।

ফুপা চিঁচিঁ করে বলছেন—সুরমা আমি মরে যাচ্ছি। ও সুরমা আমি মরে যাচ্ছি।

বমি করতে করতে কোনো মাতাল মারা যায় বলে আমার জানা নেই। কাজেই আমি রাস্তায় নেমে এলাম। সিগারেট কেনা দরকার।

আকাশে মেঘের আনাগোনা। বৃষ্টি হবে কিনা কে জানে। হলে ভালোই হয়। এই বৎসর এখনো বৃষ্টিতে ভেজা হয় নি। নবধারা জলে স্নান বাকি আছে।

সিগারেটের সঙ্গে জরদা দেয়া দুটো পান কিনলাম। জরদার নাম সবই পুংলিঙ্গে—দাদা জরদা, বাবা জরদা। মা জরদা, খালা জরদা এখনো বাজারে আসে নি যদিও মহিলারাই জরদা বেশি খান। কোনো একটা জরদা কোম্পানিকে এই আইডিয়াটা দিয়ে দেখলে হয়।

প্রথমবার ঢোকার সময় ফুপুকে যত গম্ভীর দেখলাম দ্বিতীয়বারের তার চেয়েও বেশি গম্ভীর মনে হলো। ফুপু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। কাজের মেয়ে বালতি

আর ঝাঁটা হাতে যাচ্ছে। কাজের ছেলেটির হাতে ফিনাইল। ফুপুর কিছুটা শুচিবায়ুর মতো আছে। আজ সারারাতই বোধহয় ধোয়াধুয়ি চলবে।

ফুপু বললেন, তুই তাহলে আছিস। আমি ভাবলাম চলে গিয়েছিস।

পান কিনতে গিয়েছিলাম। ফুপার অবস্থা কী?

অবস্থা কী জিজ্ঞেস করছিস লজ্জা করে না? তোর সামনে গিলল, তুই একবার না করতে পারলি না? চাকরবাকর আছে। কী লজ্জার কথা। তুই কি আজ এখানে থাকবি?

হ্যাঁ।

এখানে থাকার তোর দরকারটা কী?

এত রাতে যাব কোথায়?

ফুপু শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। টেলিফোনে ক্রমাগত রিং হচ্ছে। এগিয়ে গেলাম টেলিফোনের দিকে। রিনকির ঘর পর্যন্ত টেলিফোন নেয়া যায় নি। তার এত লম্বা নয়। টেলিফোন বারান্দায় রাখা। আমি রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে উদ্বিগ্ন গলা পাওয়া গেল, এটা কি রিনকিদের বাসা?

হ্যাঁ।

দয়া করে ওকে একটু ডেকে দেবেন?

আপনি কে আমি জানতে পারি? এ বাড়ির নিয়মকানুন খুব কড়া, অপরিচিত লোক যদি রিনকিকে ডাকে তাহলে রিনকিকে বলা যাবে না।

আমি এজাজ।

আপনি কি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার?

জি।

আমাকে আপনি চিনবেন না আমার নাম....

আপনি কে তা আমি বুঝতে পেরেছি—আপনি হচ্ছেন হিমু ভাই।

আমি সত্যি সত্যি চমৎকৃত হলাম। এর মধ্যে রিনকি আমার গল্প করে ফেলেছে? এমনভাবে করেছে যে ভদ্রলোক চট করে আমার কয়েকটা বাক্যতেই আমাকে চিনে ফেললেন। ভদ্রলোকের বুদ্ধি তো ভালোই। এমন বুদ্ধিমান এক জন মানুষ রিনকির মতো গাধা টাইপের একটি মেয়ের সঙ্গে জীবন কী করে টেনে নেবে কে জানে।

হ্যালো। হ্যালো লাইন কি কেটে গেল?

না কাটে নি।

আপনি কি হিমু ভাই?

হ্যাঁ।

রিনকি বলছে আপনার নাকি অলৌকিক সব ক্ষমতা আছে।

কী রকম ক্ষমতা?

প্রফেটিক ক্ষমতা। আপনি নাকি ভবিষ্যতের কথা বলতে পারেন। আপনি যা বলেন তাই নাকি হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। এই জাতীয় প্রসঙ্গ এলে চুপ করে থাকাই নিরাপদ। হ্যাঁ-না কিছু বললেই তর্কের মুখোমুখি হতে হয়। তর্ক করতে আমার ভালো লাগে না।

হ্যালো হ্যালো। লাইনটা ডিসটার্ব করছে।

হ্যালো হিমু ভাই।

বলুন।

আপনি কি দয়া করে একটু রিনকিকে...

ওকে তো দেয়া যাবে না। ও আশেপাশে নেই। বাবার সেবা করছে। উনি অসুস্থ।

অসুস্থ? কী বলছেন? সিরিয়াস কিছু?

সিরিয়াস বলা যেতে পারে।

বলেন কী! আমি কি আসব?

আমি কয়েক মুহূর্ত দ্রুত চিন্তা করে বললাম, আসতে অসুবিধা হবে নাতো?

না-না, অসুবিধা কী! আমার গাড়ি আছে।

আকাশের অবস্থা ভালো না। ঝড়বৃষ্টি হতে পারে।

হোক। বিপদের সময় উপস্থিত না থাকলে কী করে হয়?

তাতো বটেই। আপনি এক্ষুণি রওনা না হয়ে ঘণ্টাখানেক পরে আসুন।

কেন বলুন তো?

এমনি বললাম।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনার কথা অগ্রাহ্য করব না যেসব কথা আমি শুনেছি—মাই গড। আপনি দয়া করে আমার সম্পর্কেও কিছু বলবেন। মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট।

আচ্ছা বলব।

হিমু ভাই তাহলে রাখি? আর ইয়ে আমি যে আসছি এটা রিনকিকে বলবেন না। একটা সারপ্রাইজ হবে।

আমার টেলিফোন ব্যাধি আছে। একবার টেলিফোনে কারো সঙ্গে কথা বললে, আবার অন্য কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। রূপাদের বাসায়

করলাম। রূপার বাবা ধরতেই বললাম, আচ্ছা এটা কি রেলওয়ে বুকিং? রূপার বাবা বললেন, জি না। আপনার রং নাম্বার হয়েছে। তখন আমি বললাম, জাস্ট ওয়ান মিনিট, রূপা কি জেগে আছে?

রূপার বাবার হাইপ্রেশার বা এইজাতীয় কিছু বোধহয় আছে। অল্পতেই রেগে গিয়ে এমন হইচই শুরু করেন যে বলার না। আমার কথাতেও তাই হলো। তিনি চিড়চিড়িয়ে উঠলেন, কে? কে? এই ছোকরা তুমি কে?

তিনি খুব হইচই করতে লাগলেন। আমি রিসিভার রেখে দিলাম। রূপার বাবা নিশ্চয়ই সবাইকে ডেকে এই ঘটনা বলবেন। রূপা সঙ্গে সঙ্গে বুঝবে কে টেলিফোন করেছিল। সে হাসবে না রাগ করবে কে জানে। যেখানে রাগ করা উচিত সেখানে সে রাগ করে না, হাসে। যেখানে হাসা উচিত সেখানে রাগ করে।

আমি ওয়ান সেভেনে রিং করে জাস্টিস এম. সোবাহানের বাসা চাইলাম। সম্ভব হলে মীরা বা মীরুর সঙ্গেও কথা বলা যাবে। কী বলব ঠিক করা হলো না। যা মনে আসে তাই বলব। আগে থেকে ভেবেচিন্তে কিছু বলা আমার স্বভাবে নেই।

হ্যালো?

কে মীরা?

হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?

আমার নাম টুটুল।

কে?

অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। মনে হচ্ছে মীরা ঘটনার আকস্মিকতায় বিচলিত। আমার মনে হয় কথা বলবে কি বলবে না বুঝতে পারছে না।

ভুলে গেছেন? ঐ যে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন। কী করেছিলাম আমি বলুন তো?

কোত্থেকে টেলিফোন করেছেন?

হাসপাতাল থেকে। পুলিশ মেরে আমার অবস্থা কাহিল করে দিয়েছে। রক্তবমি করছিলাম।

সে কী কথা, মারবে কেন?

পুলিশের হাতে আসামি তুলে দেবেন আর পুলিশ আসামিকে কোলে বসিয়ে মণ্ডা খাওয়াবে? আমি তো আপনাদের কোনোই ক্ষতি করি নি। গাড়িতে ডেকেছেন, উঠেছি। তাছাড়া আপনারা টুটুল টুটুল করছিলেন। আমার ডাক নামও টুটুল।

আপনি কিন্তু বলেছেন আপনার নাম টুটুল নয়।

হ্যাঁ বলেছিলাম। কারণ বুঝতে পারছিলাম আপনি অন্য টুটুলকে খুঁজছিলেন

যার কপালে একটা কাটা দাগ।

ওপাশে অনেকক্ষণ কোনো কথা শোনা গেল না। অন্ধকারে ঢিল ছুড়েছিলাম। মনে হচ্ছে লেগে গেছে। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। যা বলি প্রায় সময়ই তা কেমন যেন মিলে যায়। টুটুলের কপালের কাটা দাগের কথাটা হঠাৎ মনে এসেছিল। ভাগ্যিস এসেছিল।

হ্যালো আপনি কোন্ হাসপাতালে আছেন?

কেন, দেখতে আসবেন?

বলুন না কোন্ হাসপাতালে।

বাসায় চলে যাচ্ছি। ওরা বুকের এক্সরে করেছে। দুটা স্টিচ দিয়েছে। বলেছে ভরতি হবার দরকার নেই।

আমি এক্ষুণি বাবাকে বলছি। বাবা থানায় টেলিফোন করবেন।

আমি শব্দ করে হাসলাম।

হাসছেন কেন?

পুলিশ কি কখনো মারের কথা স্বীকার করে? কখনো করে না। আচ্ছ রাখি।

না না রাখবেন না। প্লিজ রাখবেন না। প্লিজ।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। ঠিক তখন প্রবল বর্ষণ শুরু হলো। কালবোশেখী ঝড়। কালবোশেখী ঝড় সাধারণত চৈত্র মাসেই হয়। ঝড়ের নাম হওয়া উচিত ছিল কালচৈত্র ঝড়। দেখতে দেখতে অসহ্য গরম চলে গিয়ে চারদিকে হিমশীতল হয়ে গেল। নির্ঘাত আশেপাশে কোথাও শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। ছাদে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজব কি ভিজব না মনস্থির করতে পারছি না।

রিনকি বের হয়ে এল বাবার ঘর থেকে। তাকে কেমন যেন শঙ্কিত মনে হচ্ছে। আমি বললাম, রিনকি তুই একটু বসার ঘরে যা। কলিংবেল বাজতেই দরজা খুলে দিবি।

রিনকি বিস্মিত গলায় বলল, কেন?

তোর জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।

রিনকি নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে কলিংবেল বাজল। আমার মনটাই অন্যরকম হয়ে গেল। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দেখা হোক দুই জনের। দীর্ঘস্থায়ী হোক এই মুহূর্ত। রিনকি দরজা খুলেছে। না জানি তার কেমন লাগছে।

আমি বাদলের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। নদীটাকে আনা যায় কি না দেখা যাক। যদি আনতে পারি ওদের দুই জনকে কিছুক্ষণের জন্যে এই নদী ব্যবহার করতে দেব।

হিমু ভাই।

তুই কি এখনো জেগে আছিস?

হুঁ। রাতে আমার ঘুম হয় না।

বলিস কী!

ঘুমের ওষুধ খাই। তাতেও লাভ হয় না। দশ মিলিগ্রাম করে ফ্রিজিয়াম।

আজ খেয়েছিস?

না। আজ সারারাত তোমার সঙ্গে গল্প করব।

গল্প করতে ইচ্ছা করছে না। আয় তোকে ঘুম পাড়িয়ে দি।

ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না।

আজ ঘুমিয়ে থাক। কাল গল্প করব।

ঘুম আসবে না।

বললাম ঘুম এনে দিচ্ছি। নাকি তুই আমার কথা বিশ্বাস করিস না?

কী যে বল। কেন বিশ্বাস করব না? তুমি যা বল তাই হয়।

বেশ তাহলে চোখ বন্ধ কর।

করলাম।

মনে কর তুই হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিস। চৈত্র মাসের কড়া রোদ। হাঁটছিস শহরের রাস্তায়।

হ্যাঁ।

এখন তুই শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিস। গ্রাম, বিকেল হচ্ছে। সূর্য নরম। রোদে কোনো তেজ নেই। ফুরফুরে বাতাস। তোর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে।

হুঁ।

হঠাৎ তোর সামনে একটা নদী পড়ল। নদীতে হাঁটু জল। কী ঠাণ্ডা পানি। কী পরিষ্কার। আঁজলা ভরে তুই পানি খাচ্ছিস। ঘুমে তোর চোখ জড়িয়ে আসছে। ইচ্ছা করছে নদীর মধ্যেই শুয়ে পড়তে।

হুঁ।

নদীর ধারে বিশাল একটা পাকুড়গাছ। তাই সে পাকুড়গাছের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিস। এখন শুয়ে পড়লি। খুব নরম হালকা দূর্বাঘাসের উপরে শুয়েছিস। আর জেগে থাকতে পারছিস না। রাজ্যের ঘুম তোর চোখে।

বাদল এবার আর হুঁ বলল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ভারী নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। এই ঘুম সহজে ভাঙবে না।

কেউ যদি এটাকে কোনো অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কিছু ভেবে বসেন তাহলে ভুল করবেন। পুরো ব্যাপারটার পেছনে কাজ করছে আমার প্রতি বাদলের অন্ধভক্তি। যে ভক্তি কোনো নিয়ম মানে না। যার শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো।

বাদল না হয়ে অন্য কেউ যদি হত তাহলে আমার এই পদ্ধতি কাজ করত না। এই ছেলেটা আমাকে বড়ই পছন্দ করে। সে আমাকে মহাপুরুষের পর্যায়ে ফেলে রেখেছে।

আমি মহাপুরুষ না।

আমি ক্রমাগত মিথ্যাকথা বলি। অসহায় মানুষদের দুঃখ আমাকে মোটেই অভিভূত করে না। একবার আমি এক জন ঠেলাঅলার গালে চড়ও দিয়েছিলাম। ঠেলাঅলা হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে আমাকে রাস্তার ড্রেনে ফেলে দিয়েছিল। নোংরা পানিতে আমার সমস্ত শরীর মাখামাখি। সেই অবস্থাতেই উঠে এসে আমি তার গালে চড় বসালাম। বুড়ো ঠেলাঅলা বলল, ধাক্কা দিয়ো না ফেললে আপনে গাড়ির তলে পড়তেন।

আসলেই তাই। যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক সেখান দিয়ে একটা পাজেরো জিপ টার্ন নিল। নতুন আসা এই জিপগুলোর আচার-আচরণ ট্রাকের মতো।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, মরলে মরতাম। তাই বলে তুমি আমাকে নর্দমায় ফেলবে?

ঠেলাঅলা করুণ গলায় বলল, মাফ কইরা দেন। আর ফেলুম না।

আমি আগের চেয়ে রাগী গলায় বললাম, মাফের কোনো প্রশ্নই আসে না। তুমি কাপড় ধোয়ার লন্ড্রির পয়সা দেবে।

গরিব মানুষ।

গরিব মানুষ, ধনী মানুষ বুঝি না। বের কর কী আছে!

অবাক বিস্ময়ে বুড়ো আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, কোনো কথা শুনতে চাই না। বের কর কী আছে।

মাঝে মাঝে মানুষকে তীব্র আঘাত করতে ভালো লাগে। কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় কাউকে দগ্ধ করার আনন্দের কাছে সব আনন্দই ফিকে। এই লোকটি আমার জীবন রক্ষা করেছে। সে কল্পনাও করে নি কারোর জীবন রক্ষা করে সে এমন বিপদে পড়বে। যদি জানত এই অবস্থা হবে তাহলেও কি সে আমার জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করত?

বুড়ো গামছায় মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, বুড়োমানুষ মাফ কইরা দেন।

টাকা-পয়সা কিছু তোমার কাছে নেই?

জ্বে না। কাইলও কোনো টিরিপ পাই নাই, আইজও পাই নাই।

যাচ্ছ কোথায়?

রায়ের বাজার।

ঠিক আছে আমাকে কিছুদূর তোমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাও। এতে খানিকটা হলেও উশুল হবে।

আমি তার গাড়িতে উঠে বসলাম। বৃদ্ধ আমাকে টেনে নিয়ে চলল। পেছন থেকে ঠেলছে তার নাতি কিংবা তার ছেলে। এই পৃথিবীর নিষ্ঠুরতায় তারা দুইজনই মর্মাহত। পৃথিবী যে খুবই অকরুণ জায়গা তা তারা জানে। আমি আরো ভালোভাবে তা জানিয়ে দিচ্ছি।

রাস্তায় এক জায়গায় ঠেলাগাড়ি থামিয়ে আমি চা আনিয়ে গাড়িতে বসে বসেই খেলাম। তাকিয়ে দেখি বাচ্চাছেলেটির চোখমুখ ক্রোধ ও ঘৃণায় কালো হয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপর। আমি তার ভেতর এই ক্রোধ এবং এই ঘৃণা আরো বাড়ুক তাই চাচ্ছি। মানুষকে সহ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সহজ কথা না। সবাই তা পারে না। যে পারে তার ক্ষমতাও হেলাফেলা করার মতো ক্ষমতা না।

বুড়ো রাস্তার উপর বসে গামছায় হাওয়া খাচ্ছে। তার চোখে আগেকার বিস্ময়ের কিছুই আর এখন নেই। একধরনের নির্লিপ্ততা নিয়ে সে তাকিয়ে আছে।

আমি চা শেষ করে বললাম, বুড়ো মিয়া চল যাওয়া যাক। আমরা আবার রওনা হলাম। মোটামুটি নির্জন একটা জায়গায় এসে বললাম, থামাও গাড়ি থামাও। এখানে নামব।

আমি নামলাম। পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগ বের করলাম। আমার মানিব্যাগ সব সময়ই খালি থাকে। আজ সেখানে পাঁচশো টাকার দুটা চকচকে নোট আছে। মজিদের টিউশনির টাকা। মজিদ টাকা হাতে পাওয়া মাত্র খরচ করে ফেলে বলে তার টাকা-পয়সার সবটাই থাকে আমার কাছে।

বুড়া মিয়া।

জ্বি।

তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। কাজটা খুব ভালো কর নি। যাই হোক করে ফেলেছ যখন, তখন তো আর কিছু করার নাই। তোমাকে ধন্যবাদ। দেখি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে কেমন লাগে। তোমাকে আমি সামান্য কিছু টাকা দিতে চাই। এই টাকাটা আমার জীবন রক্ষা করার জন্যে না। তুমি যে কষ্ট করে রোদের মধ্যে আমাকে টেনে টেনে এতদূর আনলে তার জন্যে। পাঁচশ তোমার, পাঁচশ এই ছেলেটার।

বুড়ো হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

আমি কোমল গলায় বললাম, এই রোদের মধ্যে আজ আর গাড়ি নিয়ে বের হয়ো না। বাসায় চলে যাও। বাসায় গিয়ে বিশ্রাম কর।

বুড়োর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

ব্যাপারটা এরকম ঘটবে আমি তাই আশা করছিলাম। বাচ্চাছেলেটির মুখে ক্রোধ ও ঘৃণার চিহ্ন এখন আর নেই। তার চোখ এখন অসম্ভব কোমল। আমি বললাম, এই তোর নাম কী রে?

লালটু মিয়া।

প্যান্টের বোতাম লাগা বেটা। সব দেখা যাচ্ছে। লালটু মিয়া হাত দিয়ে প্যান্টের ফাঁকা অংশ ঢাকতে ঢাকতে বলল, বোতাম নাই।

তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান। হাত সরিয়ে ফেল। আলো হাওয়া যাক।

লালটু মিয়া হাসছে।

হাসছে বুড়ো ঠেলাঅলা। তাদের কাছে এখন আমি তাদের এক জন। বুড়ো বলল, আব্বাজি আসেন, তিন জনে মিল্যা চা খাই। তিয়াশ লাগছে।

পয়সা কে দেবে? তুমি? আমার হাতে কিন্তু আর একটা পয়সাও নেই।

বুড়ো আবার হাসল।

আমরা একটা চায়ের দোকানের দিকে রওনা হলাম। নিজেকে সেই সময় মহাপুরুষ মহাপুরুষ বলে মনে হচ্ছিল। আমি মহাপুরুষ নই। কিন্তু এই ভূমিকায় অভিনয় করতে আমার বড় ভালো লাগে। মাঝে মাঝে এই ভূমিকায় আমি অভিনয় করি, মনে হয় ভালোই করি। সত্যিকার মহাপুরুষরাও সম্ভবত এত ভালো করতেন না।

আমি অবশ্যি এখন পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষ দেখি নি। তাঁদের চিন্তাভাবনা কাজকর্ম কেমন তাও জানি না। মহাপুরুষদের কিছু জীবনী পড়েছি, সেইসব জীবনীও আমাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। টলস্টয় তের বছরের এক জন বালিকাকে ধর্ষণ করেছিলেন। সেই ভয়াবহ ঘটনা তিনি স্বীকার করেছেন। আমরা সবাই তো আমাদের ভয়ংকর পাপের কথা স্বীকার করি।

আমার মতে মহাপুরুষ হচ্ছে এমন এক জন যাকে পৃথিবীর কোনো মালিন্য স্পর্শ করে নি। এমন কেউ সত্যি সত্যি জন্মেছে এই পৃথিবীতে?

ঘুমুতে চেষ্টা করছি। ঘুমুতে পারছি না। অসহ্য গরম ঘুমুতে আমার কষ্ট হয় না, কিন্তু আজকের এই ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম আসছে না। শীত শীত লাগছে। খালিগায়ে থাকার জন্যে লাগছে। খালিগায়ে থাকার কারণ আমার পাঞ্জাবি এখন বাদলের গায়ে।

শুয়ে শুয়ে ছেলেবেলার কথা ভাবতে চেষ্টা করছি। বিশেষ কোনো কারণে নয়। ঘুমুবার আগে কিছু একটা নিয়ে ভাবতে হয় বলেই ভাবা।

৩

আমার শৈশব যাদের সঙ্গে কেটেছে—তারা কেমন?

জন্মের সময় আমার মা মারা যান, কাজেই মার কথা কিছুই জানি না। তিনি দেখতে কেমন তাও জানি না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে তাঁর কোনো ছবি নেই।

বাবা মারা যান আমার ন-বছর বয়সে। তাঁর কথাও তেমন মনে নেই। তাঁর কথা মনে পড়লেই একটা উদ্বিগ্ন মুখ মনে আসে। সেই মুখে বড় বড় দুটি চোখ। ভারী চশমায় ঢাকা বলে সেই চোখের ভাবও ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় পানির ভেতর থেকে কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বাবার উদ্বিগ্ন গলা, কিরে তোর ব্যাপারটা কী বল তো? যত্ন হচ্ছে না? আমি তো প্রাণপণ করছি। অবশ্যি ছেলে মানুষ করার কায়দা-কানুনও আমি জানি না। কী যে ঝামেলায় পড়লাম। তোর অসুবিধাটা কী বল তো? পেট ব্যথা করছে?

বাবার বোধহয় ধারণা ছিল শিশুদের একটিমাত্র সমস্যা—পেটব্যথা। তারা যখন মন খারাপ করে বসে থাকে তখন বুঝতে হবে তার পেট ব্যথা করছে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে কোনো শিশু যদি জেগে উঠে কাঁদতে থাকে তখন বুঝতে হবে তার পেটে ব্যথা।

বাবার কাছ থেকে কত অসংখ্যবার যে শুনেছি—কী রে হিমু তোর কি পেট ব্যথা না কি? মুখটা এমন কালো কেন? কোন্ জায়গাটায় ব্যথা দেখি।

বাবা যে এক জন পাগল ধরনের মানুষ এটা বুঝতে আমার তেমন দেরি হয় নি। শিশুদের বোধশক্তি ভালো। পাগল না হলে নিজের ছেলের নাম কেউ হিমালয় রাখে?

স্কুলে ভরতি করাতে নিয়ে গেলেন। হেডস্যার গম্ভীর গলায় বললেন, ছেলের নাম কী বললেন—হিমালয়?

জি।

আহমদ বা মোহাম্মদ এইসব কিছু আছে?

জি না, শুধুই হিমালয়।

হেডস্যার অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, ও আচ্ছা।

বাবা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, নদীর নামে মানুষের নাম হয়, ফুলের নামে হয়, গাছের নামে হয়, হিমালয়ের নামে নাম হতে দোষ কী?

হিমালয় নাম রাখার বিশেষ কোনো তাৎপর্য কি আছে?

অবশ্যই আছে—যাতে এই ছেলের হৃদয় হিমালয়ের মতো বড় হয় সেইজন্যই এই নাম।

তাহলে আকাশ নাম রাখলেন না কেন? আকাশ তো আরো বড়।

বড় হলেও তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। হিমালয়কে স্পর্শ করা যায়।

কিছু মনে করবেন না, এই নামে স্কুলে ছেলে ভরতি করা যাবে না।

এমন কোনো আইন আছে যে হিমালয় নাম রাখলে সেই ছেলে স্কুলে ভরতি হতে পারবে না?

আইন টাইন আমি জানি না। এই ছেলেকে আমি স্কুলে নেব না।

কেন?

সিট নেই।

আগে তো বললেন সিট আছে।

এখন নেই।

শিক্ষক হয়ে মিথ্যাকথা বলছেন—তাহলে তো এখানে কিছুতেই ছাত্র ভরতি করা উচিত না। মিথ্যাকথা বলা শিখবে।

খুব ভালো কথা। তাহলে এখন যান।

এই দীর্ঘ কথোপকথনের কিছুই আমার মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। বাবা প্রতিটি ঘটনা লিখে রেখে গেছেন বলে বলতে পারলাম। বাবার মধ্যে গবেষণাধর্মী একটা স্বভাব ছিল। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পাতার পর পাতা পরিষ্কার অক্ষরে লিখে গেছেন।

তাঁর বিদ্যা ছিল ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবার পর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন আর ফিরে যান নি।

জীবিকার জন্যে ঠিক কী কী করতেন তা পরিষ্কার নয়। জোতিষবিদ্যা, সমুদ্রজ্ঞান, লক্ষণ বিচার এই জাতীয় বইয়ের স্তূপ দেখে মনে হয় মানুষের হাতটাত দেখতেন। একটা প্রেসের সঙ্গেও সম্ভবত যুক্ত ছিলেন। কয়েকটা নোটবইও লিখেছিলেন। নোটস অন প্রবেশিকা সমাজবিদ্যা। এ রকম একটা বই।

তাঁর পরিবারের কারোর সঙ্গে তাঁর কোনোই যোগাযোগ ছিল না। তাঁদের সম্পর্কে আমি জানতে পারি বাবার মৃত্যুর পর। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাবা তাঁর বড়বোনকে একটি চিঠি লিখে জানান যে তাঁর মৃত্যু হলে আমাকে যেন আমার মার বাড়ি পাঠানো হয়। এটাই তাঁর নির্দেশ। এর অন্যথা যেন না হয়।

চিঠি পাওয়ার পরপরই বাবার দিকের আত্মীয়স্বজনে আমাদের ছোট বাসা ভরতি হয়ে যায়। আমার দাদাজানকে তখনি প্রথম দেখি। সুঠাম স্বাস্থ্যের টকটকে গৌরবর্ণের এক জন মানুষ। চেহারার কোথায় যেন জমিদার-জমিদার একটা ভাব আছে। তিনি আমার মরণাপন্ন বাবার হাত ধরে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, আমার ভুল হয়েছে। আমি বাবা তোর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। যথেষ্ট পাগলামি হয়েছে, আর না।

আমার বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা যাক ক্ষমা করলাম। কিন্তু আমি চাই না আমার ছেলে আপনাদের সঙ্গে মানুষ হোক। ও যাবে তার মামাদের কাছে।

তার মামারা কি আমাদের চেয়ে ভালো?

না ওরা পিশাচ শ্রেণীর—ওদের সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু শিখবে।

আমার দাদাজান এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন। বৃদ্ধ এক জন জমিদার ধরনের মানুষ কাঁদছে—এই দৃশ্যটি সত্যি অদ্ভুত। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তুই এক পাগল, তোর ছেলেটাকেও তুই পাগল বানাতে চাস?

এই নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

আমাদের বড়লোক আত্মীয়স্বজনরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে আমাদের বাসার সাজসজ্জা দেখতে থাকেন। এর ফাঁকে ফাঁকে বাবার সঙ্গে আমার দাদাজানের কিছু কথাবার্তা হলো। যেমন—

ঢাকায় কতদিন ধরে আছিস?

প্রায় তিন বছর।

এর আগে কোথায় ছিলি?

তা দিয়ে আপনার দরকার কী?

তোর মা যখন অসুস্থ তখন সব খবরের কাগজে তোর ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।

খবরের কাগজ আমি পড়ি না।

আমার বড়ফুপু এই পর্যায়ে হাত ইশারা করে আমাকে ডাকলেন। আদুরে গলায় বললেন, খোকা তোমার নাম কী?

আমি বললাম, হিমালয়।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

দাদা দুঃখিত গলায় বললেন, ছেলের নাম কি সত্যি সত্যি হিমালয় রেখেছিস?

হুঁ।

বাবার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে তাঁকে বড় একটা ক্লিনিকে ভরতি করা হলো। আপত্তি করার মতো অবস্থাও তাঁর ছিল না। কথা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুই একটা ছোটখাটো বাক্য বলতেও তাঁর অসম্ভব কষ্ট হত। তাঁকে বাইরে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হবে এমন কথা শোনা যেতে লাগল। বাবা তাঁদের সেই সুযোগ দিলেন না। ক্লিনিকে ভরতি হবার ন-দিনের দিন মারা গেলেন।

সজ্ঞানের মৃত্যু যাকে বলে। মৃত্যুর আগমুহূর্তেও টনটনে জ্ঞান ছিল। আমাকে বললেন, তোমার জন্যে কিছু উপদেশ লিখে রেখে গেছি। সেগুলো মন দিয়ে

পড়বে। তবে লেখাটা অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ করবার সময় হলো না। আমার দিকের কোনো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবে না এবং তাদের সাহায্য নেবে না। তবে ষোল বছর পরে তুমি যদি মনে কর আমার সিদ্ধান্ত ভুল, তখন তুমি নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এর আগপর্যন্ত মামাদের সঙ্গে থাকবে। মনে রাখবে তোমার মামারা পিশাচ শ্রেণীর। পিশাচ শ্রেণীর মানুষদের সংস্পর্শে না এলে, মানুষের সৎগুণ সম্পর্কে ধারণা হবে না।

ডাক্তার সাহেব এই পর্যায়ে বললেন, আপনি দয়া করে চুপ করুন। ঘুমুবার চেষ্টা করুন।

বাবা শীতল গলায় বললেন, প্রতিপদ শুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ায় আমার মৃত্যু হবার কথা। কাজেই আমাকে বিরক্ত করবেন না। সবচে জরুরি কথাটাই আমার ছেলেকে বলা হয়নি—শোন হিমু, কোনোরকম উচ্চাশা রাখবি না। টাকা-পয়সা করতে হবে, বড় হতে হবে, এইসব নিয়ে মোটেও ভাববি না। সমস্ত কষ্টের মূলে আছে আমাদের উচ্চাশা। আমার উচ্চাশা ছিল বলে প্রথমদিকে খুবই কষ্ট পেয়েছি। শেষের দিকে উচ্চাশা ত্যাগ করতে পেরেছিলাম তাই খানিকটা আনন্দে ছিলাম। আনন্দে থাকাটাই বড় কথা। সবসময় আনন্দে থাকার চেষ্টা করবি।

বাবা কথা বলতে বলতেই একটু থামলেন, হঠাৎ গভীর আগ্রহ এবং বিস্ময়ের সঙ্গে চারদিকে তাকালেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, ও আচ্ছা তাহলে এর নামই মৃত্যু। এটা মন্দ কী? মৃত্যু তাহলে খুব ভয়াবহ নয়।

তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবার মৃত্যু হলো।

আমি কিছুদিন আমার দাদাজানের সঙ্গে থাকলাম। তিনি আমার প্রসঙ্গে বারবার বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন।

আরে এটা কেমন ছেলে! বাবা মরে গেল একফোঁটা চোখের পানি নেই। এ তো দেখি তার বাপের চেয়ে পাগল হয়েছে। এই দিকে আয়। বাপ-মা মারা গেলে চোখের পানি ফেলতে হয়।

আমি শীতল গলায় বললাম, আমাকে তুই-তুই করে বলবেন না।

তিনি চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দাদাজানের বাড়িটা বিশাল। সেই বিশাল বাড়ির দোতলায় একটা ঘর আমাকে দেয়া হলো। সেই ঘরে এই বাড়ির ছেলে-মেয়েদের জন্যে সার্বক্ষণিক প্রাইভেট টিউটর থাকেন। তাঁর নাম কিসমত মোল্লা।

তিনি যখন শুনলেন আমি কোনো স্কুলে পড়ি না, এতদিন বাবার কাছে পড়েছি তখন একবারে আকাশ থেকে পড়লেন।

কী পড়েছ বাবার কাছে?

ইংরেজি, বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল, আর নীতিশাস্ত্র।

নীতিশাস্ত্রটা কী?

কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় এইসব।

কী বলছ কিছুই তো বুঝলাম না।

যেমন ধরুন মিথ্যা। মিথ্যা বলা মন্দ। তবে আনন্দের জন্যে মিথ্যা বলায় অন্যায় নেই। মিথ্যা দিয়ে আমরা সত্যকে চিনতে পারি।

বলছ কী এসব! বুঝিয়ে বল।

যেমন ধরুন গল্প-উপন্যাস। এসব মিথ্যা। কিন্তু এসব মিথ্যা দিয়ে আমরা সত্যকে চিনতে পারি।

মাস্টার সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। নিজেকে অতি দ্রুত সামলে নিয়ে বললেন—অমাবস্যা ইংরেজি কী জানো?

জানি। অমাবস্যা হলো নিউমুন। বলে নিউমুন কিন্তু আকাশে তখন চাঁদ থাকে না।

মৃন্ময় শব্দের মানে কী?

মৃন্ময় হলো মাটির তৈরি।

মাস্টার সাহেব আমার কথাবার্তায় অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন, কিন্তু বাড়ির অন্য কেউ হলো না। আমার দাদাজান ক্রমাগত বলতে লাগলেন—তোর বাবা ছিল পাগল। উন্মাদ। ও যেসব শিখিয়েছে সব ভুলে যা। সব নতুন করে শিখবি। তোকে ভালো ইংরেজি স্কুলে ভরতি করে দেব। আর শোন তোর নাম দিলাম চৌধুরী ইমতিয়াজ। মনে থাকবে?

দাদাজান বাড়িতে ঘোষণা করে দিলেন—একে কেউ হিমালয় বা হিমু, কিছুই ডাকতে পারবে না। এর নাম ইমতিয়াজ চৌধুরী। ডাক নাম টুটুল। মনে থাকবে? এই ছেলের মাথার ভেতর এই নাম দুটা ঢুকিয়ে দিতে হবে। সারাদিনে খুব কম করে হলেও একে পঁচিশবার চৌধুরী ইমতিয়াজ এবং পঁচিশবার টুটুল ডাকতে হবে, Its an order.

আমাকে সত্যি সত্যি একটা ইংরেজি স্কুলে ভরতি করে দেয়া হলো। স্কুলের পোশাক বানানো হলো।

প্রথমদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি ময়লা পায়জামা-পাঞ্জাবির উপর একটা কোট চড়িয়ে অত্যন্ত রুগ্‌ণ এক লোক বসার ঘরে বসে আছে। তার হাতে চকচকে নতুন একটা ছাতা, মনে হচ্ছে আজই কেনা হয়েছে। ভদ্রলোকের মুখভরতি পান। এস্ট্রেতে সেই পানের পিক ফেলছেন। তাঁর বসে থাকার ভঙ্গি, পান খাওয়ার ভঙ্গি এবং পানের পিক ফেলার ভঙ্গিতে কোনো সংকোচ নেই। যেন এই বাড়ির সঙ্গে

তাঁর খুব ভালো পরিচয়। যেন এটা তাঁর নিজেরই ঘর-বাড়ি।

আমি ঘরে ঢোকামাত্রই বললেন, বাবা হিমালয়। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আমি তোমার বড়মামা। আমাকে সালাম কর।

দাদাজান গম্ভীর গলায় বললেন, আমি তো আপনাকে বলেছি তাকে নিতে পারবেন না। সে গ্রামে গিয়ে কী করবে? সে এইখানেই থাকবে। পড়াশোনা করবে। তাকে স্কুলে ভরতি করা হয়েছে।

আমার বড়মামা বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন। যেন এই রকম হাস্যকর কথা তিনি আগে কখনো শুনেন নি।

দেখেন তালুই সাহেব। ছেলের বাবা পত্র মারফত এই অধিকার দিয়ে গেছে। এখন যদি আপনারা দিতে না চান, বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। কোর্টে ফায়সালা হবে, উপায় কী? যদিও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা কোনো কাজের কথা না।

দাদাজানের মুখে কোনো কথা এল না। বড়মামা এস্ট্রেতে আর একবার পানের পিক ফেলে বললেন, বাবার ইচ্ছামতোই কাজ হোক। খামাখা আপত্তি করছেন কেন? ছেলের খরচাপাতির জন্যে মাসে মাসে টাকা দিবেন। তাহলেই তো হয়।

আপনি কী করেন?

তেমন কিছু না। সামান্য বিষয়সম্পত্তি আছে। টুকটাক ব্যবসা আছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ছিলাম। এইবার জিততে পারি নাই। সতের ভোটে ঠগ খেয়েছি। যদি অনুমতি দেন একটু বেয়াদবি করি?

কী বেয়াদবি?

একটা সিগারেট ধরাই। এমন নেশা হয়েছে না-খেলে দমটা বন্ধ হয়ে আসে।

বড়মামা অনুমতির অপেক্ষা না করেই সিগারেট ধরালেন।

দাদাজান বললেন, আপনি একে নিতে চাচ্ছেন কারণ আপনার ধারণা একে নিলে মাসে মাসে মোটা টাকা পাবেন। তাই না?

বড়মামা অত্যন্ত বিস্মিত হওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, এই হাতের পাঁচ আঙুলের ভিতর দিয়া অনেক টাকা গেছে। অনেক টাকা আসছে। টাকা আমার কাছে কিছুই না। আসছি রক্তের টানে। রক্তের টান কঠিন জিনিস তালুই সাহেব। এই-যে বোন বিয়ে দিলাম তারপরে আর কোনো খোঁজ নাই। কী যে যন্ত্রণা। কোনো চিঠিপত্র নাই। শুনি আজ এই জায়গায়, কাল শুনি ভিন্ন জায়গায়। কী যে যন্ত্রণা। যাক হিমালয় বাবাকে দেখে মনটা শান্ত হয়েছে। তা বাবা, তোমার নাম কি সত্যি হিমালয়?

আমি কিছু বলার আগেই দাদাজান বললেন, না ওর নাম চৌধুরী ইমতিয়াজ।

চৌধুরী আগে কী জন্যে? চৌধুরী থাকবে পিছে। আগে ঘোড়া তারপর গাড়ি। কী বলেন তালুই সাব?

দাদাজান কোনো উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখে-মুখে ক্রোধ ও ঘৃণা।

চা এবং কেক এনে কাজের ছেলে সামনে রাখল। বড়মামার মুখে পান। সেই অবস্থাতেই চায়ে চুমুক দিলেন। কেক হাতে নিলেন।

দাদাজান বললেন, আমার ছেলে আপনার বোনের খোঁজ পেল কী করে?

সেটা তালুই সাব, আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেই ভালো হত। আফসোস সে জীবিত নাই। আমরা আপনার ছেলেকে খুঁজে বের করি নাই। সে বন্ধুর সাথে আমাদের অঞ্চলে এসেছিল তারপরে কেমনে কেমনে হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি তালুই সাব, বিয়ের পর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। বোনের খোঁজ নাই। বোন-জামাইয়েরও খোঁজ নাই। নানা লোকে নানা কথা বলে। কেউ বলে নামকাওয়াস্তে বিয়ে করে নিয়ে গেছে, পাচার করে দেবে। ইন্ডিয়া পাকিস্তান তারপর ধরেন মিডল ইস্ট। এইসব জায়গায় মেয়েকে ভাড়া খাটাবে।

বাচ্চাছেলের সামনে এ রকম কুৎসিত কথা বলবেন না।

কুৎসিত কথা না। এগুলো সত্যিকথা। এই রকম পার্টি আছে।

সত্যিকথা সবসময় বলা যায় না।

আমার কাছে এটা পাবেন না তালুই সাব। সত্য কথা আমি বলবই। ভালো লাগুক আর না-লাগুক।

তাই নাকি?

জি। আর হিমালয় বাবাকে নিয়ে যাব। পরশু সকালে এসে নিয়ে যাব। তৈরি থাকতে বলেন। মামলার তদবিরে এসেছি। দুটা দিন লাগবে।

এই ছেলেকে আমি আপনার সঙ্গে দেব না।

এসব বলবেন না তালুই সাব। আত্মীয়ের মধ্যে গণ্ডগোল আমার পছন্দ হয় না। আইনের আশ্রয় নিলে আপনারও ক্ষতি আমারও ক্ষতি। আর্থিক ক্ষতি, মানসিক ক্ষতি। কোর্ট ফি এখন বাড়ায়ে করেছে তিনগুণ। গরিব মানুষ যে একটু মামলা-মোকদ্দমা করবে সে উপায় রাখে নাই। বাবা হিমালয়, তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে চাও না?

চাই।

এইটা তো বাপের ব্যাটা। আজ তাহলে উঠি তালুই সাব। বেয়াদবি যদি কিছু করে থাকি মাফ করে দিবেন। আপনার পায়ে ধরি।

বড়মামা সত্যি সত্যি পা ধরতে এগিয়ে গেলেন। দাদাজান চমকে সরে গেলেন।

দুই দিন পর আমি মামার সঙ্গে রওনা হলাম।

গন্তব্য ময়মনসিংহের হিরণপুর।

আমার বাবা অনেকবারই বলেছেন, আমার মামারা পিশাচ শ্রেণীর। কাজেই তাঁদের সম্পর্কে আগে থেকেই একটা ধারণা মনের মধ্যে ছিল। আমি বড়মামা এবং অন্য দুই মামার আচার-আচরণে মোটেই অবাক হলাম না।

মামার বাড়ি উপস্থিত হবার তৃতীয় দিনের একটা ঘটনার কথা বলি। এই ঘটনা থেকে মামাদের মানসিকতার একটা আঁচ পাওয়া যাবে।

বড়মামার বাড়িতে তিনটা বিড়াল ছিল। এরা খুবই উপদ্রব করত। বড়মামার নির্দেশে বিড়াল তিনটাকে ধরা হলো। তিনি বললেন, হাদিসে আছে বিড়াল উপদ্রব করলে আল্লাহর নামে এদের জবেহ্ করা যায়। তাতে দোষ হয় না। দেখি বড় ছুরিটা বার কর। এই কাজ তো আর কেউ করবে না, আমাকে করতে হবে। উপায় কী?

মামা নিজেই উঠানে তিনটা বিড়ালকে জবাই করলেন। এর মধ্যে একটা ছিল গর্ভবতী।

ঐ বাড়িতে আমার তেমন কোনো অসুবিধা হয় নি। তিন মামা একসঙ্গে স্কুলঘরের মতো লম্বা একটি টিনের ঘরে থাকতেন। পুরো বাড়িতে ছেলেপুলের বিশাল দল। তাদের জগৎ ছিল ভিন্ন। একসঙ্গে পুকুরে ঝাঁপ দেয়া, একসঙ্গে সন্ধেবেলা পড়তে বসা, একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া। জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলা, গোল্লাছুট খেলা। খাওয়াও হত একসঙ্গে। এক মামি ভাত দিয়ে যাচ্ছেন। আর এক মামি দিচ্ছেন একহাতা করে তরকারি, দুই হাতা ডাল। চামচে যা উঠে আসে তাই। কেউ বলতে পারবে না আমাকে এটা দাও ওটা দাও। বললেই চামচের বাড়ি।

আমাদের মধ্যে মারামারি লেগেই ছিল। এ ওকে মারছে। সে তাকে মারছে। সেসব নিয়ে কোনো নালিশও হচ্ছে না। নালিশ দেয়ায় বিপদ আছে। এক জন নালিশ দিল—কার বিরুদ্ধে নালিশ, কী সমাচার ভালোমতো শোনাই হলো না। হাতের কাছে যে কয়েকজনকে পাওয়া গেল পিটিয়ে লাশ বানিয়ে ফেলা হলো। সত্যিকার অপরাধী হয়তো শাস্তিও পেল না।

আমি এই বিশাল দলের সঙ্গে অবলীলায় মিশে গেলাম। সীমাহীন স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা সচরাচর শিশুরা পায় না।

আমরা কী করছি না করছি বড়রা তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাত না।

এক জনের হয়তো জ্বর হয়েছে। সে বিছানায় শুয়ে কুঁ কুঁ করছে। কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না। নিতান্ত বাড়াবাড়ি না হলে ডাক্তার নেই। মাসে একবার নাপিত এসে সবকটা ছেলের মাথা প্রায় মুড়িয়ে দিয়ে ধান নিয়ে চলে যাচ্ছে। কাপড়-জামারও কোনো ঠিকঠিকানা নেই। এ ওরটা পরছে। ও তারটা পরছে।

মামাদের বাড়ি থেকেই আমি মেট্রিক পাস করি। যে বছর মেট্রিক পাস করি, বড়মামা সেই বছরই মারা যান। তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না। বলতে গেলে গ্রামের সবাই ছিল তাঁর শত্রু।

এক অন্ধকার বৃষ্টির রাতে এক জন কেউ মাছ মারবার কোঁচ দিয়ে বড়মামাকে গেঁথে ফেলে। বিশাল কোঁচ। মামার পেট এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে যায়। কোঁচের খানিকটা পিঠ ছেঁদা করে বের হয়ে থাকে।

উঠানে চাটাই পেতে মামাকে শুইয়ে রাখা হয়। দৃশ্য দেখার জন্যে সারা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ে।

তাঁকে সদরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মহিষের গাড়ির ব্যবস্থা হলো। মামা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এতক্ষণ বাঁচব না। তোমরা আমাকে থানায় নিয়ে যাও। মরার আগে আমি কারা এই কাজ করেছে বলে যেতে চাই।

মামা কাউকেই দেখেন নি তবু তিনি মৃত্যুর আগে আগে থানার ওসির কাছে চার জনের নাম বললেন। তিনি বললেন, তাঁর হাতে টর্চ ছিল। তিনি টর্চ ফেলে ফেলে এদের দেখেছেন।

ওসি সাহেব মামার দেয়া জবানবন্দি লিখতে লিখতে বললেন— ভাই সাহেব, এই কাজটা করবেন না। ডেথ বেড কনফেসন খুব শক্ত জিনিস। শুধুমাত্র এর উপরই কোর্ট রায় দিয়ে দেবে। নির্দোষ কিছু মানুষকে আপনি জড়াচ্ছেন। এদের ফাঁসি না হলেও যাবজ্জীবন হয়ে যাবে।

মামা বললেন, যা বলছি সবই সত্যি। কোরান মজিদ আনেন। আমি মজিদে হাত দিয়া বলি—।

ওসি সাহেব বললেন, তার দরকার হবে না। নিন এখানে সই করুন। এটা আপনার জবানবন্দি।

মামা সই করলেন। মারা গেলেন থানাতেই। মরবার আগে মেজোমামাকে কানে কানে বললেন, এক ধাক্কায় চার শত্রু শেষ। কাজটা মন্দ হয় না।

চার শত্রু শেষ করার গাঢ় আনন্দ নিয়ে মামা মারা গেলেন। তবে মৃত্যুর আগে আগে মৌলানা ডাকিয়ে তওবা করলেন। তাঁকে খুবই আনন্দিত মনে হলো।

বড়মামি ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিলেন। তাকে ডেকে বললেন, তওবা করে ফেলেছি। এখন আর চিন্তা নাই। সব পাপ মাপ হয়ে গেল। সরাসরি বেহেশতে দাখিল হব। খামাখা কান্দ কেন? তওবা সময়মতো করতে না পারলে অসুবিধা ছিল। আল্লাহ্ পাকের অসীম দয়া। সময় পাওয়া গেছে। কান্দাকাটি না করে আমার কানের কাছে দরুদ পড়। কোরান মজিদ পাঠ কর।

মামার মৃত্যুর পর আমি ঢাকায় চলে এলাম। নতুন জীবন শুরু হলো বড়ফুপুর সঙ্গে।

প্রবল ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখি বড়ফুপু। পাশের বিছানা খালি। বাদল নেই। সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম যে জিনিসটা জানতে ইচ্ছা করে তা হচ্ছে—কটা বাজে?

বড়ফুপুকে এই প্রশ্ন করব না ভাবছি তখন তিনি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, কেলেঙ্কারি হয়েছে।

কি কেলেঙ্কারি?

মানুষকে মুখ দেখাতে পারব না রে।

আমি বিছানায় বসতে বসতে বললাম, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার রাতে এসেছিল, তারপর আর রাতে ফিরে যায় নি—তাইতো?

তুই জানলি কী করে?

অনুমান করছি।

আমি সকালে একতলায় নেমে দেখি ঐ ছেলে আর রিনকি। ছেলে নাকি রাতে তোর ফুপার অসুখের খবর পেয়ে এসেছিল। ঝড়বৃষ্টি দেখে আর ফিরে যায় নি। আর ঐ বদ মেয়ে সারারাতে ঐ ছেলের সঙ্গে গল্প করেছে।

বল কী?

আমার তো হাত ঘামছে। কীরকম বদ মেয়ে চিন্তা করে দেখ। মেয়ের কতবড় সাহস। ঐ ছেলে এসেছে ভালো কথা। আমাকে তো খবরটা দিবি?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ঐ ছেলেরই বা কেমন আক্কেল রাতদুপুরে এল কীজন্যে?

হ্যাঁ দেখ না কাণ্ড। বিয়ে হয় নি কিছু না, শুধু বিয়ের কথা হয়েছে–এর মধ্যে নাকি সারারাত জেগে গল্প করতে হবে। রাত কি চলে গেছে নাকি?

খুবই সত্য কথা।

এখন ধর কোনো কারণে বিয়ে যদি ভেঙে যায় তারপর আমি মুখ দেখাব কী ভাবে?

আমি এক্ষুনি নিচে যাচ্ছি ফুপু, ঐ ফাজিল ছেলের গালে ঠাশ করে একটা চড় মারব। তারপর দ্বিতীয় চড় রিনকির গালে। মেয়ে বলে তাকে ক্ষমা করার কোনো অর্থ হয় না।

তুই সবসময় অদ্ভুত কথাবার্তা বলিস কেন? ঐ ছেলের গালে তুই চড় মারতে পারবি?

কেন পারব না?

যে ছেলে দুই দিন পর এ বাড়ির জামাই হচ্ছে তার গালে তুই চড় মারতে

চাস? তোর কাছে এলাম একটা পরামর্শের জন্যে।

আজই ওদের বিয়ে লাগিয়ে দাও।

আজই বিয়ে লাগিয়ে দেব?

হুঁ। কাজি ডেকে এনে বিয়ে পড়িয়ে দাও—ঝামেলা চুকে যাক। তারপর ওরা যত ইচ্ছা রাত জেগে গল্প করুক। আসল অনুষ্ঠান পরে হবে। বিয়েটা হয়ে যাক।

ফুপু নিশ্বাস ফেললেন। মনে হচ্ছে আমার কথা তাঁর মনে ধরেছে। আমি বললাম, তুমি চাইলে আমি ছেলেকে বলতে পারি।

ওরা আবার ভাববে না তো আমরা চাপ দিচ্ছি?

চাপাচাপির কী আছে? ছেলে এমন কী রসগোল্লা? মার্বেলের মতো সাইজ। বিয়ে যে দিচ্ছি এতেই তো তার ধন্য হওয়া উচিত। তার তিন পুরুষের ভাগ্য যে আমরা...

ফুপু বিরক্তস্বরে বললেন, ছেলে এমন কী খারাপ?

খারাপ তা তো বলছি না—একটু শর্ট। তা পুরুষমানুষের শর্টে কিছু আসে যায় না। পুরুষ হচ্ছে সোনার চামচ। সোনার চামচ বাঁকাও ভালো।

আজই বিয়ের ব্যাপারে ছেলে কি রাজি হবে?

দেখি কথা বলে। আমার ধারণা হবে।

তোর কথা তো সবসময় আবার মিলে যায়—একটু দেখ কথা বলে।

আমি আমার পাঞ্জাবি খুঁজে পেলাম না। ফুপু বললেন, বাদল ভোরবেলায় ঐ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বের হয়েছে।

আমি বাদলের একটা শার্ট গায়ে দিয়ে নিচে নামতেই মেরিন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব লাজুক গলায় বললেন, হিমু ভাই আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। খুব লজ্জা লাগছে অবশ্যি।

বলে ফেল।

রিনকির খুব শখ পূর্ণিমারাতে সমুদ্র কেমন দেখায় সেটা দেখবে। দুই দিন পরেই পূর্ণিমা।

ও আচ্ছা—দুই দিন পরেই পূর্ণিমা তা তো জানতাম না।

মানে কথার কথা বলছি ধরুন আজ যদি বিয়েটা হয়ে যায়—তাহলে আজ রাতের ট্রেনে রিনকিকে নিয়ে কক্সবাজারের দিকে রওনা হতে পারি। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাটা শেষ করে রাখা আর কী। পরে একটা রিসিপশানের ব্যবস্থা না হয় হবে।

তোমার দিকের আত্মীয়স্বজনরা...

ওদের আমি ম্যানেজ করব। আপনি যদি শুধু এদের বুঝিয়েসুঝিয়ে একটু

রাজি করান—মানে রিনকি বেচারির দীর্ঘদিনের শখ। ওর জন্যেই খারাপ লাগছে।

না না, তা তো বটেই। দীর্ঘদিনের শখ থাকলে তা তো মেটানোই উচিত। রাতের টিকেট পাওয়া যাবে তো? পুরো ফার্স্টক্লাস বার্থ রিজার্ভ করতে হবে।

রেলওয়েতে আমার লোক আছে হিমু ভাই।

তাহলে তুমি বরং ঐটাই আগে দেখ। আমি এদিকটা ম্যানেজ করছি।

আনন্দে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চোখ চকচক করছে। সে গাঢ় গলায় বলল, রিনকি আমাকে বলেছিল—হিমু ভাইকে বললে উনি ম্যানেজ করে দিবেন। আপনি যে সত্যি সত্যি করবেন বুঝিনি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কী নিয়ে গল্প করলে সারারাত?

গল্প আর কী করব বলুন। রিনকি এমন অভিমানী—কিছু বললেই তার চোখে পানি এসে যায়। সুপার সেনসেটিভ মেয়ে। কথায় কথায় একসময় বলেছিলাম যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় হেনা নামের একটা মেয়ের সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছিল—এতেই রিনকি কেঁদে অস্থির। আমাকে বলেছে আর কোনোদিন যদি আমি ঐ মেয়ের নাম মুখে আনি সে নাকি সুইসাইড করবে। এ রকম মেয়ে নিয়ে বাস করা কঠিন হবে। খুবই দুশ্চিন্তা লাগছে হিমু ভাই।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে কিন্তু মোটেও চিন্তিত মনে হলো না। বরং খুবই আনন্দিত মনে হলো। আমার ধারণা প্রায়ই সে হেনার কথা বলে রিনকিকে কাঁদাবে। কাঁদিয়ে আনন্দ পাবে। রিনকিও কেঁদে আনন্দ পাবে। ওদের এখন আনন্দেরই সময়।

আমি বললাম, কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই। তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনকে বল। তার চেয়ে যা জরুরি তা হচ্ছে টিকিটের ব্যবস্থা। আমি ফুপা-ফুপুকে রাজি করাচ্ছি।

রাজি হয়েছে কি-না জেনে গেলে ভালো হত না—হিমু ভাই?

আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি তুমি কি এটা জানো না?

জানি।

আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তোমরা দুই জন হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের পাড়ে হাঁটছ। অসম্ভব সুন্দর জোছনা হয়েছে। সমুদ্রের পানি রুপার মতো চকচক করছে আর তোমরা...

আমরা কী?

থাক সবটা বললে রহস্য শেষ হয়ে যাবে।

আপনি এক জন অসাধারণ মানুষ হিমু ভাই। অসাধারণ।

আমি এবং বাদল ওদের এগারটার ট্রেনে তুলে দিতে এলাম। ফুপা-ফুপু

এলেন না। ফুপার শরীর খারাপ করছে।

ট্রেন ছাড়বার আগমূহূর্তে রিনকি বলল, হিমু ভাই আমার কেমন জানি ভয় ভয় করছে।

কীসের ভয়?

এত আনন্দ লাগছে। আনন্দের পরই তো কষ্ট আসে। যদি খুব কষ্ট আসে?

কষ্ট আসবে না। তোদের জীবন হবে আনন্দময়। তোদেরকে আমি আমার ময়ূরাক্ষী নদী ব্যবহার করতে দিয়েছি। এই নদী যারা ব্যবহার করে তাদের জীবনে কষ্ট আসে না।

তুমি কী যে পাগলের মতো কথা মাঝে মাঝে বল। কিসের নদী?

আছে একটা নদী। আমি আমার অতিপ্রিয় মানুষদের শুধু সেই নদী ব্যবহার করতে দিই। অন্য কাউকে দিই না, তুই আমার অতি প্রিয় এক জন। যদিও খানিকটা বোকা। তবু প্রিয়।

তুমি একটা পাগল। তোমার চিকিৎসা হওয়া দরকার।

ট্রেন নড়ে উঠল। আমি জানালার সঙ্গে সঙ্গে এগুতে লাগলাম। রিনকির আনন্দময় মুখ দেখতে এত ভালো লাগছে। রিনকির চোখে এখন জল। সে কাঁদছে। আমি মনে মনে বললাম—হে ঈশ্বর, এই কান্নাই রিনকি নামের মেয়েটির জীবনের শেষ কান্না হোক।

৫

প্রায় দশদিন পর আস্তানায় ফিরলাম।

আস্তানা মানে মজিদের মেস—দি নিউ বোর্ডিং হাউস।

মজিদ ঐ বোর্ডিং হাউসে দীর্ঘদিন ধরে আছে। কলেজে যখন পড়তে আসে তখন এই অন্ধ গহ্বর খুঁজে বের করে। নামমাত্র ভাড়ায় একটা ঘর। সেই ঘরে একটা চৌকি, একটা টেবিল। চেয়ারের ব্যবস্থা নেই কারণ চেয়ার পাতার জায়গা নেই।

মজিদের চৌকিতে একটা শীতল পাটি শীত-গ্রীষ্ম সবসময় পাতা থাকে। মশারিও খাটানো থাকে। প্রতিদিন মশারি তোলা এবং মশারি ফেলার সময় মজিদের নেই। তাকে সকাল থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত নানান ধান্ধায় ঘুরতে হয়, প্রতিমাসে তিনটি মনিঅর্ডার করতে হয়। একটা দেশের বাড়িতে, একটা তার বিধবা বড়বোনের কাছে এবং তৃতীয়টি আবু কামাল বলে এক ভদ্রলোককে। এই ভদ্রলোক মজিদের কোনো আত্মীয় নন। তাকে প্রতিমাসে কেন টাকা পাঠাতে হয় তা মজিদ কখনো বলে নি। জিজ্ঞেস করলে হাসে। এইসব রহস্যের কারণেই মজিদকে আমার বেশ পছন্দ।

আমাকে মজিদের পছন্দ কিনা আমি জানি না। সে মানুষের সঙ্গে সম্পূর্ণ অনাগ্রহ নিয়ে মেশে। কোনোকিছুতেই অবাক বা বিস্ময় প্রকাশ করে না। সম্ভবত শৈশবেই তার বিস্মিত হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় তাকে একবার একটা ম্যাজিক শো দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাচ এক জাদুকর জার্মান কালচারাল সেন্টারে জাদু দেখাচ্ছেন। বিস্ময়কর কাণ্ডকারখানা একের পর এক ঘটে যাচ্ছে। একসময়ে তিনি তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে করাত দিয়ে কেটে দুই টুকরা করে ফেললেন। ভয়াবহ ব্যাপার। মহিলা দর্শকরা ভয়ে উঁ উঁ জাতীয় শব্দ করছে। তাকিয়ে দেখি মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্ষীণ নাকডাকার শব্দও আসছে। আমি চিমটি কেটে তার ঘুম ভাঙালাম। সে বলল, কী হয়েছে? আমি বললাম, করাত দিয়ে মানুষ কাটা হচ্ছে।

মজিদ হাই তুলে বলল, ও আচ্ছা।

সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল। অথচ আমি অনেক ঝামেলা করে দুইটা টিকিট জোগাড় করেছি যাতে একবার অন্তত সে বিস্মিত হয়। আমার ধারণা তাজমহলের সামনেও তাকে যদি নিয়ে যাওয়া হয় সে হাই চাপতে চাপতে বলবে, ও আচ্ছা এইটাই তাজমহল। ভালোই তো। মন্দ কী।

মজিদকে আমার একবার তাজমহল দেখানোর ইচ্ছা। শুধু দেখার জন্য— সত্যি সত্যি সে কী করে। বা আসলেই সে কিছু করে কি-না।

দশদিন পর মজিদের সঙ্গে আমার দেখা—সে একবার মাত্র মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। তারপর পত্রিকা পড়তে লাগল। বছরখানেক আগের বাসি একটা ম্যাগাজিন। একবার জিজ্ঞেসও করল না, আমার খবর কী। আমি কেমন। এতদিন কোথায় ছিলাম।

আমি বললাম, তোর খবর কিরে মজিদ?

মজিদ এই প্রশ্নের উত্তর দিল না। অপ্রয়োজনীয় কোনো প্রশ্নের উত্তর সে দেয় না।

তোর আজ টিউশনি নেই? ঘরে বসে আছিস যে?

আজ শুক্রবার।

তখন মনে পড়ল ছুটির দিনে যখন তার হাতে কোনো কাজ থাকে না তখনই সে ম্যাগাজিন জোগাড় করে। ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঘুমায়, আবার জেগে উঠে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টায়, কিছুক্ষণ পর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। জীবনের কাছে তার যেন কিছুই চাওয়ার বা পাওয়ার নেই। চার-পাঁচটা টিউশনি, মাঝেমধ্যে কিছু খুচরা কাজ এবং প্রুফ দেখার কাজেই সে খুশি। বিএ পাস করার পর কিছুদিন সে চাকরির চেষ্টা করেছিল। তারপর—'দুর আমার হবে না।' এই

বলে সব ছেড়েছুড়ে দিল।

আমি একবার বলেছিলাম, সারাজীবন এই করেই কাটাবি নাকি? সে বলল, অসুবিধা কী? তুই তো কিছু না-করেই কাটাচ্ছিস।

আমার অবস্থা ভিন্ন। আমার কোনো দায়দায়িত্ব নেই। তাছাড়া আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি। তুই তো কিছু করছিস না।

মজিদ কিছুই বলল না। আমি ভেবেছিলাম, একবার হয়তো জিজ্ঞেস করবে কিসের এক্সপেরিমেন্ট, তাও করল না। আসলেই তার জীবনে কোনো কৌতূহল নেই।

রূপাকে অনেক বলেকয়ে একবার রাজি করেছিলাম যাতে সে মজিদকে নিয়ে চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে আসে। আমার দেখার ইচ্ছা একটি অসম্ভব রূপবতী এবং বুদ্ধিমতী মেয়েকে পাশে পেয়ে তার মনের ভাব কী হয়। আগের মতোই সে কি নির্লিপ্ত থাকে, না জীবন সম্পর্কে খানিকটা হলেও আগ্রহী হয়।

আমার প্রস্তাবে রূপা প্রথমে খুব রাগ করল। চোখ তীক্ষ্ণ করে বলল, তুমি নিজে কখনো আমাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়েছ? চিনি না জানি না একটা ছেলেকে নিয়ে আমি যাব। তুমি আমাকে পেয়েছ কী?

সে যতই রাগ করে, আমি ততই হাসি। রূপাকে ঠাণ্ডা করার এই একটা পথ। সে যত রাগ করবে আমি তত হাসব। আমার হাসি দেখে সে আরো রাগবে। আমি আরো হাসব। সে হাল ছেড়ে দেবে। এবারো তাই হলো। সে মজিদকে নিয়ে যেতে রাজি হলো। আমি একটি ছুটির দিনে মজিদকে বললাম, তুই চিড়িয়াখানা থেকে ঘুরে আয়। পত্রিকায় দেখলাম জিরাফ এনেছে।

মজিদ বলল, জিরাফ দেখে কী হবে?

কিছুই হবে না। তবু দেখে আয়।

ইচ্ছে করছে না।

আমার এক দূর-সম্পর্কের ফুপাতো বোন—বেচারির চিড়িয়াখানা দেখার শখ। সঙ্গে কোনো পুরুষমানুষ না থাকায় যেতে পারছে না। আমার আবার জন্তু-জানোয়ার ভালো লাগে না। তুই তাকে নিয়ে যা।

মজিদ বলল, আচ্ছা।

আমার ধারণা ছিল রূপাকে দেখেই মজিদ একটা ধাক্কা খাবে। সেরকম কিছুই হলো না। রূপা গাড়ি নিয়ে এসেছিল, মজিদ গম্ভীরমুখে ড্রাইভারের পাশে বসল।

রূপা হাসিমুখে বলল, আপনি সামনে বসছেন কেন? পেছনে আসুন। দু জন গল্প করতে করতে যাই। মজিদ বলল, আচ্ছা।

পেছনে এসে বসল। তার মুখ ভাবলেশহীন। একবার ভালো করে দেখলও

না তার পাশে যে বসে আছে সে মানবী না অপ্সরী।

ফিরে আসার পর জিজ্ঞেস করলাম, কেমন দেখলি?

ভালোই।

কথা হয়েছে রূপার সঙ্গে?

হুঁ।

কী কথা হলো?

মনে নেই।

আচ্ছা রূপার পরনে কী রঙের শাড়ি ছিল বল তো?

লক্ষ্য করি নি তো।

আমি মজিদের সঙ্গে অনেক সময় কাটাই। রাতে তার সঙ্গে এক চৌকিতে ঘুমাই। তার কাছ থেকে শিখতে চেষ্টা করি কী করে আশেপাশের জগৎ সম্পর্কে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হওয়া যায়। সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেক সাধনায় যে স্তরে পৌঁছেন মজিদ সে স্তরটি কী করে এত সহজে অতিক্রম করল তা আমার জানতে ইচ্ছা করে।

আমার বাবা তাঁর খাতায় আমার জন্য যেসব উপদেশ লিখে রেখে গেছেন তার মধ্যে একটার শিরোনাম হচ্ছে : নির্লিপ্ততা। তিনি লিখেছেন—

নির্লিপ্ততা

পৃথিবীর সকল মহাপুরুষ এবং মহাজ্ঞানীরা এই জগৎকে মায়া বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমি আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় দেখিয়াছি আসলেই মায়া। স্বামী ও স্ত্রীর প্রেম যেমন মায়া বই কিছুই নয়, ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্নেহ সম্পর্কেও তাই। যে কারণে স্বার্থে আঘাত লাগিবা মাত্র—স্বামী-স্ত্রীর প্রেম বা ভ্রাতা-ভগ্নীর ভালোবাসা কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। কাজেই তোমাকে পৃথিবীর সর্ববিষয়ে পুরোপুরি নির্লিপ্ত হইতে হইবে। কোনোকিছুর প্রতিই তুমি যেমন আগ্রহ বোধ করিবে না আবার অনাগ্রহও বোধ করিবে না। মানুষ মায়ার দাস। সেই দাসত্ব শৃঙ্খল তোমাকে ভাঙ্গিতে হইবে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। চেষ্টা করিলে তুমি তা পারিবে। তোমার ভেতরে সে ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা বিকাশের চেষ্টা আমি তোমায় শৈশবেই করিয়াছি। একই সঙ্গে তোমাকে আদর এবং অনাদর করা হয়েছে। মাতার প্রবল ভালোবাসা হইতেও তুমি বঞ্চিত হইয়াছ। এই সমস্তই একটি পরীক্ষার অংশ। এই পরীক্ষায় সফলকাম হইতে পারিলে প্রমাণ হইবে যে ইচ্ছা করিলে মহাপুরুষদের এই পৃথিবীতে তৈরি করা যায়।

যদি একটি সাধারণ কুকুরকেও যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, সেই কুকুর

শিকারি কুকুরে পরিণত হয়। এক জন ভালোমানুষ পরিবেশের চাপে ভয়াবহ খুনিতে রূপান্তরিত হয়। যদি তাই হয় তবে কেন আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মানব-সম্প্রদায় তৈরি করিতে পারিব না?

বাবা আমার ভেতর থেকে মায়া কাটানোর চেষ্টা করেছেন। শৈশবের কথা কিছু মনে আছে। একটা খেলনা হয়তো আমার খুব পছন্দ হলো। তিনি কিনে আনলেন। গভীর আনন্দে আমি আত্মহারা। তখন হঠাৎ বাবা বললেন, আচ্ছা আয় এইবার এই খেলনা ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলি। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন?

এমনি।

বাবা একটা হাতুড়ি নিয়ে খেলনা ভাঙতে বসতেন। আমি কাঁদো-কাঁদো চোখে তাকিয়ে দেখতাম।

একবার খাঁচায় করে একটা টিয়াপাখি নিয়ে এলেন। কী সুন্দর সবুজ রঙ। লাল টুকটুকে ঠোঁট। আমি বললাম, বাবা আমরা কি এটা পুষব?

তিনি হাসিমুখে বললেন হ্যাঁ। আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি বললাম, টিয়াপাখি কী খায় বাবা?

শুকনো মরিচ খায়।

ঝাল লাগে না?

না। একটা শুকনোমরিচ নিয়ে এসে দাও দেখবে কীভাবে কপকপ করে খাবে।

আমি ছুটে গেলাম শুকনোমরিচ আনতে। মরিচ এনে দেখি বাবা টিয়াপাখিটা গলা টিপে মেরে ফেলেছেন। এমন সুন্দর একটি পাখি মরে পড়ে আছে। ভয়ংকর একটা ধাক্কা লাগল। বাবা বললেন, মন খারাপ করবি না। মৃত্যু হচ্ছে এ জগতের আদি সত্য।

তিনি তাঁর পুত্রের মন থেকে মায়া কাটাতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর চেষ্টা কতটা সফল হয়েছে? মায়া কি কেটেছে? আমার তো মনে হয় না।

এই যে মজিদ চুপচাপ বসে আছে, পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে—কেন জানি বড় মায়া লাগছে তাকে দেখে। এই মায়া আমার বাবা শত ট্রেনিঙেও কাটাতে পারেন নি। অথচ মজিদ কোনোরকম ট্রেনিং ছাড়াই সব মায়া কাটিয়ে বসে আছে। মজিদকে ছাত্র হিসেবে পেলে বাবার লাভ হত।

মজিদ।

কী?

আমার হাতে একটা চাকরি আছে করবি?

কী চাকরি?

কী চাকরি জানি না। আমার বড়ফুপা বলেছিলেন জোগাড় করে দিতে পারেন।

তিনি আমাকে চেনেন কীভাবে?

তোকে চেনেন না। চাকরিটা আমার জন্য। তবে আমি তোকে পাইয়ে দেব।

দরকার নেই।

দরকার নেই কেন?

টাকা-পয়সার টানাটানি তো এখন আর আগের মতো নেই। দেশে এবার থেকে আর পাঠাতে হবে না।

কেন?

বাবা মারা গেছেন।

সেকি!

আমি বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলাম। মজিদ বলল, এত অবাক হচ্ছিস কেন? বুড়ো হয়েছে মারা গেছে। কিছুদিন পর আর বোনকেও টাকা পাঠাতে হবে না।

সেও কি মারা যাচ্ছে?

না। তার ছেলে পাস করে গেছে। বিএ পাস করেছে। চাকরিবাকরি কিছু পেয়ে যাবে।

তুই চাস না তোর একটা গতি হোক?

আরে দূর দূর। ভালোই তো আছি।

মজিদ হাই তুলল। আমি বললাম ভাত খেয়েছিস?

না, চল খেয়ে আসি।

রাস্তায় নেমেই মজিদ বলল, বিয়েবাড়ি-টাড়ি কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখবি? বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছে করছে।

আমি বললাম, বিয়েবাড়ি খুঁজতে হবে না। চল পুরনো ঢাকায় নিয়ে গিয়ে তোকে বিরিয়ানি খাওয়াব। টাকা আছে।

আবার এতদূর যাব? আজ ছুটির দিন ছিল। একটু হাঁটলেই বিয়েবাড়ি পেয়ে যেতাম।

তুই কি একটা বিয়ে করবি নাকি?

আমি? আরে দূর দূর। বিয়ে করা মানে শতেক যন্ত্রণা। শতেক দায়িত্ব ভালো লাগে না।

সিগারেট খাবি?

মজিদ হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। দিলে খাবে। না দিলে খাবে না।

আমি রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলাম। মজিদ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে টানছে। আমি বললাম, তুই দিন দিন কী হয়ে যাচ্ছিস বল তো?

কী হচ্ছি?

গাছ হয়ে যাচ্ছিস।

সত্যি সত্যি গাছ হতে পারলে ভালোই হত।

আমরা রিকশার খোঁজে বড়রাস্তা পর্যন্ত চলে এলাম। রিকশা আছে তবে ওরা কেউ পুরনো ঢাকার দিকে যাবে না। দূরের ট্রিপে ওদের ক্ষতি। কাছের ট্রিপে পয়সা বেশি, পরিশ্রমও কম। এতকিছু মাথায় ঢুকবে না এ রকম বোকা এক জন রিকশাঅলার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

মজিদ।

বল।

তুই দেখ রিকশা পাস কিনা। আমি চট করে একটা টেলিফোন করে আসি।

আচ্ছা।

আমি টেলিফোন করতে ঢুকলাম তরঙ্গিণী নামের স্টেশনারী দোকানে। আজকাল চমৎকার সব দোকান হয়েছে। এদের নামও যেমন সুন্দর, সাজসজ্জাও সুন্দর। আমাকে দেখেই দোকানের সেলসম্যান—জামান এগিয়ে এল। এই ছেলের বয়স অল্প। সুন্দর চেহারা। একদিন দেখি দোকানে আর আসছে না। মাস দুএক পরে আবার এসে উপস্থিত—সমস্ত মুখভরতি বসন্তের দাগ। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, কারণ পৃথিবী থেকে বসন্ত উঠে গেছে। এই ছেলে সেই বসন্ত পেল কী করে? সবসময় ভাবি জিজ্ঞেস করব, জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না। তার মুখে দাগ হবার পর তার ব্যবহার খুব ভালো হয়েছে। আগে ব্যবহার খুব খারাপ ছিল।

জামান হাসিমুখে বলল, স্যার ভালো আছেন?

হুঁ।

টেলিফোন করবেন?

যদি টলিফোনে ডায়াল টোন থাকে এবং টেলিফোনের চাবি থাকে তাহলে করব। দুইটা টেলিফোন করব—এই যে চার টাকা।

টাকা দিয়ে সবসময় লজ্জা দেন স্যার।

লজ্জার কিছু নেই। টেলিফোন শেষে আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। প্রায়ই জিজ্ঞেস করব ভাবি কিন্তু মনে থাকে না। আজ আপনি মনে করিয়ে দিবেন।

জি আচ্ছা।

আমার সামনে টেলিফোন দিয়ে জামান সরে গেল।

এইটুকু ভদ্রতা আছে। অধিকাংশ দোকানেই টেলিফোন করতে দেয় না। টাকা দিয়েও না। যদিও দেয়—রিসিভারের আশেপাশে ঘুরঘুর করে কী কথা হচ্ছে শুনবার জন্যে।

হ্যালো কে কথা বলছেন?

তুমি কি মীরা?

হ্যাঁ হ্যাঁ আমি মীরা। আপনি কে আমি বুঝতে পারছি—আপনি টুটুল।

আসল জন না। নকল জন।

ঐদিন খট করে টেলিফোন রেখে দিলেন কেন? আমার অসম্ভব কষ্ট হয়েছিল।

টেলিফোন নামিয়ে রাখি নি তো, হঠাৎ লাইন কেটে গেল।

আমিও তাই ভেবেছিলাম। অনেকক্ষণ টেলিফোনের সামনে বসেছিলাম। লাইন কেটে গেল তাহলে আবার করলেন না কেন?

টাকা ছিল না।

টাকা ছিল না মানে?

আমি তো বিভিন্ন দোকান-টোকান থেকে টেলিফোন করি। দুইটা টাকা পকেটে নিয়ে যাই। আরেকবার করতে হলে আরো দুই টাকা লাগবে। বুঝতে পারছ?

পারছি। এখন আপনার সঙ্গে টাকা আছে তো?

আছে।

ঐদিন আপনার টেলিফোন পাওয়ার পর বাবাকে সব বললাম। বাবাকে তো চেনেন না। বাবা খুবই রাগী মানুষ। তিনি প্রথমে আমাদের দুই জনকে খুব বকা দিলেন—আপনাকে রাস্তা থেকে তোলার জন্য এবং পথে নামিয়ে দেবার জন্য। তারপর...আচ্ছা আপনি আমার কথা শুনছেন তো?

হ্যাঁ শুনছি।

তারপর বাবা গাড়ি বের করে থানায় গেলেন। ফিরে এলেন মন খারাপ করে।

মন খারাপ করে ফিরলেন কেন?

কারণ ওসি সাহেব আপনার সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেছেন। আপনি নাকি পাগল ধরনের। তার উপর কবি।

আমি কবি?

হ্যাঁ। আপনি যে, কবিতার খাতাটা থানায় ফেলে এসেছিলেন বাবা সেইটিও নিয়ে এসেছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমি সবগুলো কবিতা পড়েছি।

কেমন লাগল?

ভালো। অসাধারণ।

সবচে ভালো লাগল কোন্‌টা?

বলব? আমার কিন্তু মুখস্থ। কবিতাটার নাম রাত্রি।

পরীক্ষা নিচ্ছি। দেখি সত্যি সত্যি তোমার মুখস্থ কিনা কবিতাটা বল।

মীরা সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করল :

অতন্দ্রিলা,
ঘুমাওনি জানি
তাই চুপিচুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে বলি শোন,
সৌর তারা-ছাওয়া এই বিছানায়—সূক্ষ্মজাল রাত্রির মশারি
কত দীর্ঘ দুজনার গেল সারাদিন,
আলাদা নিশ্বাসে—
এতক্ষণে ছায়া-ছায়া পাশে ছুঁই
কী আশ্চর্য দুজনে, দুজনা
অতন্দ্রিলা,
হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানার পরে জোছনা।
দেখি তুমি নেই।

কবিতা সে আবৃত্তি করল চমৎকার। আবৃত্তির শেষে ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, কি বলতে পারলাম?

হ্যাঁ পারলে। তোমার স্মৃতিশক্তি ভালো, তবে কবিতা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

কেন এটা কি ভালো কবিতা না?

অবশ্যই ভালো। তবে আমার লেখা না। অমিয় চক্রবর্তীর।

আপনার নোটবইয়ের সব কবিতাই কি অন্যের?

হ্যাঁ। মাঝে মাঝে কিছু কবিতা পড়ে মনে হয় এগুলো আমারই লেখার কথা ছিল, কোনো কারণে লেখা হয় নি। তখন সেটা নোটবুকে টুকে রাখি।

আপনি কি খুব কবিতা পড়েন?

না। একেবারে না। তবে আমার এক জন বান্ধবী আছে সে খুব পড়ে এবং জোর করে আমাকে কবিতা শোনায়।

ওর নাম কী?

ওর নাম রূপা। তবে আমি তাকে মাঝে মাঝে ময়ূরাক্ষী ডাকি।

বাহ্ কী সুন্দর নাম।

সে কিন্তু এই নাম একবারেই পছন্দ করে না।

কেন বলুন তো?

কারণ এই নামে এলিফেন্ট রোডে একটা জুতার দোকান আছে।

মীরা খিলখিল করে হেসে উঠল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাসল। মনে হলো মেয়েটা যে পরিবেশে বড় হচ্ছে সেই পরিবেশে কেউ রসিকতা করে না। সবাই গম্ভীর হয়ে থাকে। সামান্য রসিকতায় এই কারণেই সে এতক্ষণ ধরে হাসছে।

হ্যালো, আপনি কিন্তু টেলিফোন রাখবেন না।

আচ্ছা রাখব না।

ঐদিন আপনার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে এমন হয়েছে টেলিফোন বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই। মনে হয় আপনি টেলিফোন করেছেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আরেকটা ব্যাপার বলি—মা আপনার জন্যে খুব চমৎকার একটা পাঞ্জাবি কিনে রেখেছেন। ঐ পাঞ্জাবিটা নেয়ার জন্যে হলেও আপনাকে আমাদের বাসায় আসতে হবে।

আসব।

কবে আসবেন?

টুটুলকে খুঁজে পেলেই আসব।

আপনি ওকে কোথায় খুঁজে পাবেন?

আমি খুব সহজেই পাব। হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আমার খুব নাম ডাক আছে।

আচ্ছা ঐদিন আপনি কী করে বললেন যে টুটুল ভাইয়ের কপালে কাটা দাগ আছে?

আমার কিছু সুপারন্যাচারাল ক্ষমতা আছে। আমি মাঝে মাঝে অনেক কিছু বলতে পারি।

বলুন তো আমি কী পরে আছি?

তোমার পরনে আকাশি রঙের শাড়ি।

হলো না। আপনার আসলে কোনো ক্ষমতা নেই।

ঠিক ধরেছ।

কিন্তু আপনি যখন বলেছিলেন যে আপনার সুপারন্যাচারাল ক্ষমতা আছে, আমি বিশ্বাস করেছিলাম।

মনে হচ্ছে তোমার একটু মনখারাপ হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

টেলিফোন কি রেখে দেব?

না না—প্লিজ আপনার ঠিকানা বলুন।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। আর না। মজিদ বোধহয় রিকশা ঠিক করে ফেলেছে। তবে ঠিক করলেও সে আমাকে এসে বলবে না। অপেক্ষা করবে। এর মধ্যেই অতি দ্রুত রূপার সঙ্গে একটা কথা সেরে নেয়া দরকার।

আমি টেলিফোন করতেই রূপার বাবা ধরলেন। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, এটা কি রেলওয়ে বুকিং?

তিনি ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, ফাজিল ছোকরা, হু আর ইউ? কী চাও তুমি?

রূপাকে দেবেন?

রাসকেল, ফাজলামি করার জায়গা পাও না। আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব।

আপনি এত রেগে গেছেন কেন?

শাট আপ।

আমি ভদ্রলোককে আরো খানিকক্ষণ হইচই করার সুযোগ দিলাম। আমি জানি হইচই শুনে রূপা এসে টেলিফোন ধরবে। হলোও তাই, রূপার গলা শোনা গেল—। সে করুণ গলায় বলল, তুমি চলে এস।

কখন?

এই এখন। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব।

আচ্ছা আসছি।

অনেকবার আসছি বলেও তুমি আস নি—এইবার যদি না আস তাহলে...

তাহলে কী?

রূপা খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকব।

রূপার বাবা সম্ভবত তার হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিলেন। খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ হলো। আজ ওদের বাড়িতে ভূমিকম্প হয়ে যাবে। রূপার বাবা, মা, ভাই-বোন কেউ আমাকে সহ্য করতে পারে না। রূপার বাবা তাঁর দারোয়ানকে বলে রেখেছেন কিছুতেই যেন আমাকে ঐ বাড়িতে ঢুকতে না দেয়া হয়। আজ কী হবে কে জানে?

বাইরে এসে দেখি মজিদ রিকশা ঠিক করেছে। রিকশাঅলা রিকশার সিটে বসে ঘুমুচ্ছে। মজিদ শান্তমুখে ড্রাইভারের পাশে বসে বিশ্রাম করছে। আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আজও জামানকে জিজ্ঞেস করা হলো না—তার

মুখে বসন্তের দাগ হলো কী করে। কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যা কোনোদিনও করা হয় না। এটিও বোধহয় সেই জাতীয় কোনো প্রশ্ন।

বিরিয়ানি খেয়ে অনেক রাতে ফিরলাম।

অসহ্য গরম।

সেই গরমে ছোট্ট একটা চৌকিতে আমি এবং মজিদ শুয়ে আছি। মজিদের হাতে হাতপাখা। সে দ্রুত তার পাখা নাড়ছে। গরম তাতে কমছে না, বরং বাড়ছে। মনে হচ্ছে ময়ূরাক্ষী নদীটাকে বের করতে হবে। নয়তো এই দুঃসহ রাত পার করা যাবে না।

মজিদের হাতপাখার আন্দোলন থেমে গেছে। সে গভীর ঘুমে অচেতন। ঘরে শুনশান নীরবতা। আমি ময়ূরাক্ষী নদীর কথা ভাবতে শুরু করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য পাল্টে গেল। এই নদী একেক সময় একেক ভাবে আসে। আজ এসেছে দুপুরের নদী হয়ে। প্রখর দুপুর। নদীর জলে আকাশের ঘন নীল ছায়া। ঝিম ধরে আছে চারদিক। হঠাৎ নদী মিলিয়ে গেল। মজিদ ঘুমের মধ্যেই বিশ্রী শব্দ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এই মজিদ এই।

মজিদ চোখ মেলল।

কী হয়েছে রে?

কিছু না।

স্বপ্ন দেখেছিস?

হুঁ।

দুঃস্বপ্ন?

না।

কী স্বপ্ন দেখেছিস বলত?

মজিদ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষীণস্বরে বলল, স্বপ্নে দেখলাম বাবা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

মজিদ শুয়ে পড়ল। আমি জানি না মজিদের বাবা কীভাবে তার গায়ে হাত বুলাতেন। আমার ইচ্ছা করছে ঠিক সেই ভঙ্গিতে মজিদের গায়ে হাত বুলাতে।

হিমু।

কী?

আমার বাবা আমাকে খুব আদর করত। সব বাবারাই করে। আমার বাবা খুব বেশি করত। একদিন কী হয়েছে জানিস—

বল শুনছি।

না থাক।

থাকবে কেন শুনি। এই গরমে ঘুম আসছে না। তোর গল্প শুনলে ভালো লাগবে।

আমি তখন খুব ছোট...

তারপর?

না থাক।

মজিদ আর শব্দ করল না। ঘরের ভেতর অসহ্য গরম। আমি অনেক চেষ্টা করেও নদীটা আনতে পারছি না। আজ আর পারব না। আজ বরং বাবার কথাই ভাবি। আমার বাবা কি আমাকে ভালোবাসতেন? নাকি আমি ছিলাম তাঁর খেলার কোনো পুতুল? যে পুতুল তিনি নানাভাবে ভেঙে নতুন করে তৈরি করতে চেষ্টা করেছিলেন।

কত রকম উপদেশে তিনি তাঁর খাতা ভরতি করে রেখেছেন। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে হয়তো ভেবেছেন—এইসব উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব। আমি কি সেইসব উপদেশ মানি? নাকি মানার ভান করি। তাঁর খাতায় লেখা :

উপদেশ নম্বর এগার

সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান

সৃষ্টিকর্তার অনুসন্ধান করিবে। ইহাতে আত্মার উন্নতি হইবে। সৃষ্টিকর্তাকে জানা এবং আত্মাকে জানা একই ব্যাপার। স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিও—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

মজিদ আবার কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তবে কাঁদছে ঘুমের মধ্যে। সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সে কি প্রতিরাতেই কাঁদে?

৬

বড়ফুপু অবাক হয়ে বললেন, তুই কোত্থেকে?

আমি বললাম, আসলাম আর কি। তোমাদের খবর কী?

পনের দিন পর উদয় হয়ে বললি—তোমাদের খবর কী? তোর কত খোঁজ করছি। গিয়েছিলি কোথায়?

মজিদের গ্রামের বাড়িতে। মজিদকে নিয়ে ওর বাবার কবর জিয়ারত করে এলাম।

মজিদ আবার কে?

তুমি চিনবে না। আমার ফ্রেন্ড। আমাকে এত খোঁজাখুঁজি করছিলে কেন?

বড়ফুপু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তোকে খুঁজছি বাদলের জন্যে। ওকে তুই বাঁচা।

অসুখ?

তুই নিজে গিয়ে দেখ। ও তার পড়ার বইপত্র সব পুড়িয়ে ফেলছে। এক সপ্তাহ পরে পরীক্ষা।

বল কী!

বাদলের ঘরে গিয়ে দেখি সে বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই পড়াশুনা করছে। পরিবর্তনের মধ্যে তার মাথার চুল আরো বড় হয়েছে। দাড়িগোঁফ আরো বেড়েছে। গায়ে চকচকে সিল্কের পাঞ্জাবি। বাদল হাসিমুখে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, খবর কিরে?

বাদল বলল, খবর তো ভালোই।

তুই নাকি বই পুড়াচ্ছিস।

সব বই তো পুড়াচ্ছি না। যেগুলো পড়া হচ্ছে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলছি।

ও আচ্ছা।

বাদল হাসতে হাসতে বলল, মা-বাবা দুই জনেরই ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তোর কি ধারণা মাথা ঠিকই আছে?

হ্যাঁ ঠিক আছে—তবে মাথায় উকুন হয়েছে।

বলিস কী!

মাথা ঝাঁকি দিলে টুপটাপ করে উকুন পড়ে।

বলিস কী?

হ্যাঁ সত্যি। দেখবে?

থাক থাক দেখাতে হবে না।

হিমু ভাই, তুমি এসেছ ভালোই হয়েছে, বাবাকে বুঝিয়ে যাও। বাবার ধারণা আমার সব শেষ।

ফুপা কি বাসায়?

হ্যাঁ বাসায়। কিছুক্ষণ আগেই আমার ঘরে ছিলেন। নানান কথা বুঝাচ্ছেন।

আমি ফুপার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর স্বাস্থ্য এই কদিনে মনে হয় আরো ভেঙেছে। চোখের চাউনিতে দিশেহারা ভাব। তিনি আমার দিকে বিষণ্নচোখে তাকালেন। যে দৃষ্টি বলে দিচ্ছে, তুমিই আমার ছেলের এই অবস্থার জন্যে দায়ী। তোমার জন্যে আমার এই অবস্থা।

কেমন আছেন ফুপা?

ভালো।

রিনকি কোথায়? শ্বশুরবাড়িতে?

হ্যাঁ।

সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বসে আছেন যে? প্র্যাকটিসে যাচ্ছেন না?

আর প্রাকটিস। সব মাথায় উঠেছে।

আমি ফুপার সামনের চেয়ারে বসলাম। মনে হচ্ছে আজও তিনি খানিকটা মদ্য পান করেছেন। আমি সহজ গলায় বললাম, ফুপা ঐ চাকরিটা কি আছে?

কোন্ চাকরি?

ঐ যে আমাকে বলেছিলেন বাদলকে আগের অবস্থায় নিয়ে গেলে ব্যবস্থা করে দেবেন।

তুমি চাকরি করবে? নতুন কথা শুনছি।

আমি করব না, আমার এক বন্ধুর জন্যে।

ফুপা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, বাদলের ব্যাপারটা আমি দেখছি— আপনি ওর চাকরিটা দেখুন।

বাদলের কিছু তুমি করতে পারবে না। ও এখন সমস্ত চিকিৎসার অতীত। বইপত্র পুড়িয়ে ফেলছে। ছাদে আগুন জ্বালিয়েছে। সেই আগুনের সামনে মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর মাথা থেকে উকুন পড়ছে আগুনে। পট পট শব্দ হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ কী কাণ্ড। আমি হতভম্ব হয়ে দেখলাম। একবার ভাবলাম একটা চড় লাগাই, তারপর মনে হলো—কী লাভ!

ফুপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

আমি হাসলাম।

ফুপা বললেন, তুমি হাসছ? তোমার কাছে পুরো ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হতে পারে, আমার কাছে না।

আমি বাদলের ব্যাপারটা দেখছি, আজই দেখছি। আপনি আমার বন্ধুর চাকরির ব্যাপারটা দেখবেন।

তোমার বন্ধু কি তোমার মতোই?

না। ও চমৎকার ছেলে। সাত চড়ে রা নেই টাইপ।

আমি বাদলকে নিয়ে বের হলাম।

বাদল মহাখুশি।

রাস্তায় নেমেই বলল, তোমার পরিকল্পনা কী হিমু ভাই? সারারাত রাস্তায়

হাঁটব? দুই বছর আগের কথা কি তোমার মনে আছে? সারারাত আমরা হাঁটলাম। জোছনা রাত। মনে হচ্ছিল আমরা দস্তয়োভস্কির উপন্যাসের কোনো চরিত্র। মনে আছে?

আছে।

আজও কি সেইরকম কিছু?

না। আজ যাচ্ছি সেলুনে, দাড়িগোঁফ কামাব।

বাদল হতভম্ব হয়ে গেল। যেন এমন অদ্ভুত কথা সে জীবনে শুনেছি। ক্ষীণস্বরে বলল—দাড়িগোঁফে, লম্বা চুলে তোমাকে যে কী অদ্ভুত সুন্দর লাগে তা তো তুমি জানো না। তোমাকে অবিকল রাসপুটিনের মতো লাগে।

রাসপুটিনের মতো লাগলেও ফেলে দিতে হবে। এক জিনিস বেশিদিন ধরে রাখতে নেই। ভোল পাল্টাতে হয়। অনেকটা সাপের খোলস ছাড়ার মতো। কিছুদিন অন্য সাজে থাকব, তারপর আবার...

তাহলে কি আমিও ফেলে দেব?

দেখ চিন্তা করে।

অবশ্যি উকুনের জন্যে কষ্ট হচ্ছে। ভয়ংকর চুলকায়। রাতে ঘুম ভালো হয় না।

তাহলে বরং ফেলেই দে।

তুমি ফেললে তো ফেলবই।

বাদল হাসতে লাগল। মনে হচ্ছে গভীর কোনো আনন্দে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে আছে।

দুইজনে চুল কেটে দাড়িগোঁফ ফেলে দিলাম।

বাদল কয়েকবারই বলল, ভীষণ হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে বাতাসে উড়ে যাব।

আমি বললাম, আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখ। নিজেকে অন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছে না?

হ্যাঁ হচ্ছে।

মাঝে মাঝে নিজেকে অচেনা করাও দরকার। যখন যে সাজ ধরবি, সেই রকম ব্যবহার করবি। একে বলে ব্যক্তিত্ব রূপান্তর। বুঝতে পারছিস?

পারছি।

ফুপা এবং ফুপু তাঁদের ছেলেকে দেখে দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। সবার আগে নিজেকে সামলে নিলেন ফুপা। আমার দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় বললেন, তোমার বন্ধুকে নিয়ে কাল আমার চেম্বারে এসো। এগারটা থেকে

বারোটার মধ্যে। মনে থাকবে?

হ্যাঁ থাকবে।

হিমু মেনি থ্যাংকস।

আমি হাসলাম।

ফুপা বললেন, আমার ঘরে এসো। গল্প করি। তোমার সঙ্গে গল্পই করা হয় না।

আমি বললাম, আপনি যান আমি আসছি। একটা টেলিফোন করে আসি।

ফুপা বললেন, তোমার এই টেলিফোন-ব্যাধিরও একটা চিকিৎসা হওয়া দরকার। কার সঙ্গে এত কথা বল? ঘন্টার পর ঘণ্টা কথা। আমার তো দুটা কথা বললেই বিরক্ত লাগে।

ওপাশ থেকে হ্যালো শুনেই আমি বললাম, কে মীরা?

অনেকক্ষণ কোনো শব্দ হলো না। আমি নিশ্চিত মীরা। নিজেকে সামলাবার জন্যে সময় নিচ্ছে।

হ্যালো তুমি কি মীরা?

আপনি আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

কষ্ট দিচ্ছি?

হ্যাঁ দিচ্ছেন। নাহয় আমরা একটা ভুল করেছিলাম। সব মানুষই তো ভুল করে। সামান্য ভুলের জন্যে যদি এত কষ্ট দেন।

আমি টেলিফোন করলে কষ্ট পাও?

হ্যাঁ পাই। কারণ আপনি হঠাৎ রেখে দেন। আপনি কি মানুষটাই এমন, না ইচ্ছা করে এসব করেন?

বেশিরভাগ সময় ইচ্ছা করেই করি।

আপনি কি একবার আসবেন আমাদের বাসায়?

এখনো বুঝতে পারছি না। হয়তো আসব।

কবিতার খাতাটা নিতে আসবেন না?

ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম মীরা।

তার মানে আপনি আসবেন না?

না। মানুষের মুখোমুখি হতে আমার ভালো লাগে না। এতে অতি দ্রুত মায়া পড়ে যায়। টেলিফোনে কথা বললে মায়া জন্মানোর সম্ভাবনা কম, সেইজন্যেই টেলিফোন আমার এত প্রিয়। টেলিফোনে কথা বললে মায়া জন্মায় না। মায়া জন্মানোর অনেক কষ্ট। তা ছাড়া—

তাছাড়া কী?

থাক আরেকদিন বলব।

আপনার বান্ধবী রূপার সঙ্গে কি আপনার প্রায়ই দেখা হয়?

মাঝে মাঝে হয়। যখন সে যেতে বলে তখন যাই না। যখন যেতে বলে না তখন হঠাৎ উপস্থিত হই।

উনি কি খুবই সুন্দর?

তোমাকে তো একবার বলেছি—ও খুব সুন্দর।

আপনি টেলিফোন রেখে দেবার আগে দয়া করে শুধু একটি সত্যিকথা বলুন।

আমি তো সবই সত্যি বলছি। কী জানতে চাচ্ছ বল তো?

ঐদিন কি পুলিশ আপনাকে মেরেছিল?

না।

এইতো মিথ্যা বললেন।

আজ সত্যি বলছি। ঐদিনই মিথ্যা বলেছিলাম।

আপনার কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যা কে জানে?

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আপনাকে একটা খবর দেই। টুটুল ভাইকে পাওয়া গেছে। কাউকে কিছু না বলে একমাসের জন্যে কোলকাতা গিয়েছিল। মজার ব্যাপার কী জানেন! এখন আর আমার টুটুল ভাইকে ভালো লাগছে না। ঐদিন টেলিফোন করেছিল আমি কথাও বলি নি। আমার এ রকম হলো কেন বলুন তো?

আমি টেলিফোন রেখে ফুপার খোঁজে গেলাম।

তিনি ছাদে। হুইস্কির বোতল খোলা হয়েছে। বরফের পাত্র, ঠাণ্ডা পানি, প্লেটে ভিনিগার মেশানো চিনাবাদাম। আমাকে দেখেই তিনি খুশি-খুশি গলায় বললেন, বাদলের পরিবর্তনটা সেলিব্রেট করছি।

ফুপু রাগ করবেন না?

না, তাকে বলেছি। আজ সে কোনোকিছুতেই রাগ করবে না। বমি করে যদি সারা ঘর ভাসিয়ে দেই তবু রাগ করবে না। তুমি বস হিমু। আরাম করে বস। সম্পর্কে মিশ খাচ্ছে না। মিশ খেলে তোমাকেও খানিকটা দিতাম।

আপনি ক পেগ খেয়েছেন?

আরে না। মাত্র তো শুরু। আমি নটা পর্যন্ত পারি। আমার কিছুই হয় না।

ঐদিন বলেছিলেন ছটা।

বলেছিলাম? বলে থাকলে ভুল বলেছি। নটা হচ্ছে আমার লিমিট। নাইন। এন আই এন ই। নাইন।

আর খাবেন না ফুপা।

ফুপা গ্লাসে নতুন করে ঢালতে ঢালতে বললেন, খেতে খেতে তোমার কথাই

ভাবছিলাম। তুমি মানুষটা খারাপ না। পাগলা আছ তবে ভালো। তোমার বাবা পাগলা ছিল তবে ভালো ছিল না।

ভালো ছিল না বলছেন কেন?

দেখেছি তো। ও বাড়ি ছেড়ে পালাল আমার বিয়ের অনেক পরে। উন্মাদ ছিল।

ফুপা আপনি কিন্তু বড় দ্রুত খাচ্ছেন। শুনেছি দ্রুত খাওয়া খারাপ।

ফুপা গম্ভীর গলায় বললেন, নাইন হচ্ছে আমার লিমিট। নাইনের আগে স্টপ করে দেব। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম—আমার ধারণা তোমার বাবা ছিলেন এক জন প্রথম শ্রেণীর উন্মাদ। এটা হচ্ছে আমার ধারণা। তুমি আবার রাগ করছ না তো?

না।

ছেলেকে মহাপুরুষ বানানোর অদ্ভুত খেয়াল উন্মাদের মাথাতেই শুধু আসে বুঝলে? আরে বাবা, মানুষ কী হবে না হবে সব আগে থেকে ঠিক করা থাকে।

কে ঠিক করে রাখেন, ঈশ্বর?

প্রকৃতিও বলতে পার। ফোর্টি সিক্স ক্রমোজমে মানুষের ভবিষ্যৎ লেখা থাকে। সে কেমন হবে কী সব কিন্তু প্রিডিটারমিন্ড। জীন সব নিয়ন্ত্রণ করছে।

ফুপা আর নেবেন না।

আরে এখনি বন্ধ করব কী? নেশাটা মাত্র ধরেছে। তুমি মানুষ খারাপ না। I like you. তুমি পাগল ঠিকই তবে ভালো পাগল। তোমার বাবা ছিল খারাপ ধরনের পাগল।

বাবা সম্পর্কে কথাবার্তা থাক।

ফুপা নিচুগলায় বললেন, কাউকে যদি না বল তাহলে তোমার বাবার সম্পর্কে আমার একটি ধারণার কথা বলতে পারি। আমি আর কাউকে বলি নি। শুধু তোমাকেই বলছি।

বাদ দিন, কিছু বলতে হবে না।

জাস্ট আমার একটা ধারণা। ভুলও হতে পারে। আমার বেশিরভাগ ধারণাই ভুল প্রমাণিত হয়। হা-হা-হা। আমার বোধহয় আর খাওয়া উচিত হবে না। শুধু লাস্ট ওয়ান হয়ে যাক। ওয়ান ফর দি রোড। হিমু।

জি।

তোমার যদি ইচ্ছা করে খানিকটা খেয়ে দেখতে পার। উল্টোদিকে ফিরে খেয়ে ফেল। আমি কিছুই মনে করব না। আমার মধ্যে কোনো প্রিজুডিস নেই। তুমি হচ্ছ বন্ধুর মতো।

আমি খাব না। আপনিও বন্ধ করুন।

নটা কি হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

দশে শেষ করা যাক। জোড়সংখ্যা—তারপর তোমার বাবার সম্পর্কে কী যেন বলছিলাম?

কিছু বলছিলেন না।

বলছিলাম। মনে পড়েছে—আমার কী ধারণা জানো? আমার ধারণা তোমার বাবা, তোমার মাকে খুন করেছিল।

আমি সহজ গলায় বললাম, এ রকম ধারণা হবার কারণ কী?

যখন তোমার বাবার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হলো তখন সে অনেক কথাই বলল, কিন্তু দেখা গেল নিজের স্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলছে না। সে কীভাবে মারা গেছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। প্রশ্ন শুনে রেগে গিয়ে বলেছিল—অন্য দশটা মানুষ যেভাবে মারা যায় সেইভাবে মারা গিয়েছিল।

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, এটা শুনেই আপনি ধরে নিলেন বাবা মাকে খুন করেছেন?

হ্যাঁ। অবশ্যি আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। আমার অধিকাংশ অনুমানই ভুল হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। ফুপার অধিকাংশ অনুমান ভুল হলেও এই অনুমানটি ভুল নয়। এটা সত্যি। আমি এটা জানি। আমি ছাড়াও অন্য কেউ এটা অনুমান করতে পারে, এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

ফুপা মদের ঘোরে ঝিম মেরে বসে আছেন। আমি আকাশের তারা দেখছি।

হিমু।

জি।

তোমার বন্ধুকে কাল নিয়ে এসো, চাকরি দিয়ে দেব।

আচ্ছা।

বড় ঘুম পাচ্ছে। এখানেই শুয়ে পড়ি কেমন?

শুয়ে পড়ুন।

ফুপা কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অনেক অনেক দিন আগে বাবা আমাকে ছাদে এনে আকাশের তারা দেখিয়ে বলেছিলেন, যখনই সময় পাবি ছাদে এসে আকাশের তারার দিকে তাকাবি, এতে মন বড় হবে। ক্ষুদ্র শরীরে আকাশের মতো বিশাল মন ধারণ করতে হবে। বুঝলি? বুঝে থাকলে বল—হ্যাঁ।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

বাবা হৃষ্টগলায় বললেন, তোর উপর আমার অনেক আশা। অনেক আশা নিয়ে তোকে বড় করছি। তোর মা বেঁচে না-থাকায় খুব সুবিধা হয়েছে। ও বেঁচে থাকলে আদর দিয়ে তোকে নষ্ট করত। আমি যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি তার কিছুই করতে দিত না। পদে পদে বাধা দিত। দিত কি-না বল?

হ্যাঁ দিত।

তোর মা না-থাকায় তাহলে একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে তাই না?

হ্যাঁ।

বাবা হঠাৎ গলা নিচু করে বললেন, তোর মা যে নেই এরজন্যে আমার উপর কোনো রাগ নেই তো?

তোমার উপর রাগ হবে কেন?

বাবা অপ্রস্তুতের হাসি হাসলেন। সেই হাসি আমার বুকে বিঁধল। চট করে মনে পড়ল অনেক অনেক কাল আগে সুন্দর একটা টিয়াপাখিকে বাবা গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন। আমি শান্তস্বরে বললাম, মা কীভাবে মারা গিয়েছিলেন বাবা?

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এই প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। তোকেই খুঁজে বের করতে হবে। শুধু হৃদয় বড় হলেই হবে না, তোকে বুদ্ধিমানও হতে হবে। তোর জ্ঞান এবং বুদ্ধি হবে প্রেরিত পুরুষদের মতো। শুধু একটা জিনিস মনে রাখবি আমি যা করেছি তোর জন্যেই করেছি। আচ্ছা আয় এখন তোকে আকাশের তারাদের নাম শেখাই। একবার কালপুরুষের নাম বলেছিলাম না। বল দেখি কোন্‌টা কালপুরুষ? এত দেরি করলে তো হবে না। তাড়াতাড়ি বল। খুব তাড়াতাড়ি। কুইক।

আমি ছাদ থেকে নিচে নামলাম।

একধরনের গাঢ় বিষাদ বোধ করছি। এই ধরনের বিষাদ হঠাৎ হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে এবং প্রায় সময়ই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। মহাপুরুষদের কি এমন হয়? তারাও কি মাঝে মাঝে বিষাদগ্রস্ত হন? হয়তো হন, হয়তো হন না। কোনো এক জন মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম। আমাদের কথাবার্তা তখন কেমন হত? মনে মনে আমি কথোপকথনের মহড়া দিলাম। দৃশ্যটা এ রকম—বিশাল বটবৃক্ষের নিচে মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি শীর্ণকায় কিন্তু তাঁকে বটবৃক্ষের চেয়েও বিশাল দেখাচ্ছে। তাঁর গায়ে শাদা চাদর। সেই চাদরে তাঁর মাথা ঢাকা। ছায়াময় বৃক্ষতল। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে তাঁর জ্বলজ্বলে চোখের কালো মণি দৃশ্যমান। মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর

শিশুর কণ্ঠস্বরের মতো, কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনলে সেই কণ্ঠস্বরে এক জন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের শ্লেষজড়িত উচ্চারণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। এই কথোপকথনের সময় তিনি একবারও আমার দিকে তাকালেন না। অথচ মনে হলো তাকিয়ে আছেন।

মহাপুরুষ : বৎস তুমি কী জানতে চাও?

আমি : অনেক কিছু জানতে চাই। আপনি কি সব প্রশ্নের উত্তর জানেন?

মহাপুরুষ : আমি কোনো প্রশ্নেরই উত্তর জানি না।

আমি : তাহলে শুরুতে কেন বললেন—বৎস তুমি কী জানতে চাও।

মহাপুরুষ : আমি প্রশ্নের উত্তর জানি না, কিন্তু প্রশ্ন শুনতে ভালোবাসি। তুমি প্রশ্ন কর।

আমি : বিষাদ কী?

মহাপুরুষ : আমি জানি না।

আমি : আপনি কি কখনো বিষাদগ্রস্ত হন?

মহাপুরুষ : বিষাদ কী তাই আমি জানি না। কাজেই বিষাদগ্রস্ত হই কি হই না তা কী করে বলি। তুমি আরো প্রশ্ন কর। তোমার প্রশ্ন শুনে বড়ই আনন্দ বোধ হচ্ছে।

আমি : আনন্দ কী?

মহাপুরুষ : বৎস আনন্দ কি তা আমি জানি না।

আমি : আপনি জানেন এমন কিছু কী আছে?

মহাপুরুষ : না। আমি কিছুই জানি না। বৎস তুমি প্রশ্ন কর।

আমি : আমার প্রশ্ন করার কিছুই নেই। আপনি বিদেয় হোন।

মহাপুরুষ : চলে যেতে বলছ?

আমি : অবশ্যই—ব্যাটা তুই ভাগ।

মহাপুরুষ : তুমি কি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছ?

আমি : হ্যাঁ।

মহাপুরুষ : তাতে লাভ হবে না বৎস। তুমি বোধহয় জানো না আমাদের মান-অপমান বোধ নেই।

কথোপকথন আরো চালানোর ইচ্ছা ছিল। চালানো গেল না। ফুপু এসে বললেন, এই তুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছিস কেন?

আমি বললাম, কথা বলছি।

কার সঙ্গে বলছিস?

মহাপুরুষের সঙ্গে।

ফুপু অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই সবসময় এমন রহস্য করিস কেন? তুই আমাকে পেয়েছিস কী? আমাকেও কি বাদলের মতো পাগল ভাবিস? তুই কি ভাবিস বাদলের মতো আমিও তোর প্রতিটি কথা বিশ্বাস করব।

আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করলাম। ফুপু আমার সেই হাসি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন, তুই একটা বিয়ে কর। বিয়ে করলে সব রোগ সেরে যাবে।

বিয়ে করাটা ঠিক হবে না ফুপু।

ঠিক হবে না কেন?

যেসব রোগের কথা তুমি বলছ সেইসব রোগ কখনো সারাতে নেই। যে কারণে মহাপুরুষেরা বিয়ে করেন না। আজীবন চিরকুমার থাকেন। বিয়ে করার পর যারা মহাপুরুষ হন তাঁরা স্ত্রী-সংসার ছেড়ে চলে যান। যেমন বুদ্ধদেব।

ফুপু হতচকিত গলায় বললেন, তুই আমাকে আপনি না বলে তুমি তুমি করে বলছিস কেন?

আমি তো সবসময় তাই বলি।

সে কি! আমার তো ধারণা ছিল আপনি করে বলিস।

জি না ফুপু আপনি ভুল করছেন। আমার খুব প্রিয়জনদের আমি তুমি করে বলি। আপনি যদিও খুব কঠিন প্রকৃতির মহিলা তবু আপনি আমার প্রিয়জন। সেই কারণে আপনাকে আমি তুমি করে বলি।

এই তো এখন আপনি করে বলছিস।

কই না তো। তুমি করেই তো বলছি।

ফুপু খুবই বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে আমার খুব ভালো লাগে। সম্ভবত আমি মহাপুরুষের পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছি। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছি।

রূপার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রও হচ্ছে বিভ্রান্তি। তাকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করতে পেরেছিলাম। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো শীতকালে—

৭

পৌষমাস কিংবা মাঘমাস।

কিংবা অন্যকোনো মাসও হতে পারে। তবে শীতকাল এইটুকু মনে আছে, কারণ আমার গায়ে ছিল গেরুয়া রঙের চাদর। রূপার গায়ে হালকা লাল কার্ডিগান। প্রথমে অবশ্যি কার্ডিগানের দিকে আমার চোখ পড়ল না। আমার চোখ

পড়ল তার মাথায় জড়ানো স্কার্ফের দিকে। স্কার্ফের রঙ গাঢ় সোনালি। কাপড়ে সোনালি এবং রূপালি এই দুটি রঙ সচরাচর চোখে পড়ে না। হয়তো এই দুটি রঙ কাগজে খুব ভালো ধরে, কাপড়ে ধরে না।

সোনালি রঙের স্কার্ফ মাথায় জড়ানো বলে দূর থেকে তার চুলগুলো মনে হচ্ছিল সোনালি। দেখলাম সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি বসে আছি ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির বারান্দায়। বসেছি ছায়ার দিকে। শীতকালে সবাই রোদে বসতে ভালোবাসে। আমিও বাসি, তবু ছায়াময় কোণ বেছে নিয়েছি কারণ ঐ দিকটায় ভিড় কম।

আমি লক্ষ্য করছি রূপা আসছে। আমি তাকে চিনি, তার নাম জানি, সে যে ধবধবে শাদা গাড়িটাতে করে আসে তার নম্বরও জানি, ঢাকা ভ-৮৭৮২। শুধু আমি একা নই আমাদের ক্লাসের সব ছেলেই জানে। সবাই কোনো-না-কোনো ছলে রূপার সঙ্গে কথা বলেছে, অনেকেই তার বাসায় গেছে। অতি উৎসাহী কেউ কেউ তার জন্যে নোট এবং বইপত্র জোগাড় করেছে। রূপার জন্মদিনে সব ছেলেরা মিলে একটা জলরঙ ছবি উপহার দিল। ছবিটার নাম বর্ষা। ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি মেয়ে কদমগাছের একটু নিচু ডালে হাত দিয়ে মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

চমৎকার ছবি।

ছবিটা পাওয়া গিয়েছিল বিনা পয়সায়, তবে বাঁধাতে খরচ হলো পাঁচশ টাকা। সেই টাকা আমরা সবাই চাঁদা তুলে দিলাম।

রূপা হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে যার জন্যে চাঁদা তুলে কিছু একটা করতে কারোর আপত্তি থাকে না। ছেলেরা গভীর আগ্রহ এবং আনন্দ নিয়ে এদের সঙ্গে মেশে এবং জানে এই জাতীয় মেয়েদের সঙ্গে তারা কখনোই খুব ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না। এরা যথাসময়ে বাবা-মার পছন্দ-করা একটি ছেলেকে বিয়ে করবে, যে ছেলে সাধারণত থাকে বিদেশে।

রূপা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মাথার স্কার্ফ খুলে ফেলে বলল, কেমন আছ?

রূপাকে যেমন সবাই তুমি করে বলে, রূপাও তেমনি সবাইকে তুমি করে বলে। তার সঙ্গে দীর্ঘ দু বছরে আমার কোনো কথা হয় নি। আজ হচ্ছে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। আন্তরিক সুরে বললাম, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

রূপা বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

আমি আপনি করে বলব তা সে আশা করে নি। তাকে অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত

মনে হলো। সে এখন কী করে তাই আমার দেখার ইচ্ছা। তুমি করেই চালিয়ে যায়, না আপনি ব্যবহার করে। বাংলা ভাষাটা বড়ই গোলমেলে। মাঝে মাঝেই তরুণ-তরুণীদের বিভ্রান্ত করে। রূপা নিজেকে সামলে নিল। সহজ গলায় বলল, আপনি আপনি করছেন কেন? আমাকে অস্বস্তিতে ফেলবার জন্যে? আমি এত সহজে অস্বস্তিতে পড়ি না।

আমি বললাম, বস রূপা।

রূপা বসতে বসতে বলল, অনেকদিন থেকেই আপনার সঙ্গে আমার কথা বলার ইচ্ছা।

কথা বল।

কেন কথা বলার ইচ্ছা তা তো জিজ্ঞেস করলে না।

জিজ্ঞেস করলাম না কারণ কেন কথা বলার ইচ্ছা তা আমি জানি। তুমি লক্ষ্য করেছ যে আমি তোমার প্রতি তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করি নি। গায়ে পড়ে কথা বলতে যাই নি, টেলিফোন করি নি, হঠাৎ বাসায় উপস্থিত হই নি। ব্যাপারটা তোমার অহংকারে লেগেছে। সুন্দরী মেয়েরা খুব অহংকারী হয়। তারা সবসময় তাদের চারপাশে একদল মুগ্ধ পুরুষ দেখতে চায়।

রূপা মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বলল, তোমার কথা মোটেও ঠিক না। আমি সেজন্যে তোমার কাছে আসি নি। আমি শুনেছি তুমি ভবিষ্যতের কথা বলতে পার, হাত দেখতে পার। অলৌকিক কিছু ক্ষমতা তোমার আছে। আমি সেই সম্পর্কে জানতে চাই। আমার সঙ্গে মিথ্যাকথা বলার দরকার নেই। সত্যি করে বল তোমার কি এ জাতীয় কোনো ক্ষমতা আছে?

আছে।

কী ধরনের ক্ষমতা?

আমার কাছে একটা নদী আছে। যে কোনো সময় সেই নদীটাকে বের করতে পারি।

রূপা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বলল, এইসব আজেবাজে কথা বলে লাভ নেই। তুমি আমাকে কনফিউজ করতে পারবে না। আমার সম্পর্কে কি তুমি কিছু বলতে পার?

অবশ্যই পারি। তুমি একটা লাল গাড়িতে করে আস। গাড়ির নাম্বার ঢাকা ভ-৮৭৮২.

রূপার ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস দেখলাম। সম্ভবত আরো কিছু বলতে পারি। বলব?

বল।

খুব ছোটবেলায় তুমি ইলেকট্রিকের তারে হাত দিয়ে দুই হাত পুড়িয়ে ফেলেছিলে।

রূপা চোখ তীক্ষ্ণ করে বলল, কী করে বললে?

অলৌকিক ক্ষমতায়।

অলৌকিক ক্ষমতা না—ছাই। আমার এই গল্প সবাই জানে। আমি অনেকের সঙ্গেই হাত পুড়ে যাওয়ার গল্প করেছি। আমার মনে হয় আমাদের ক্লাসের সব ছেলেই জানে। তুমি তাদের এক জন কারো কাছ থেকে শুনেছ—ঠিক না?

হ্যাঁ ঠিক।

তাহলে তোমার কোনো ক্ষমতা-টমতা নেই?

না। তবে একটা নদী আছে। নদীটার নাম ময়ূরাক্ষী।

আবার ফাজলামি করছ?

ফাজলামি করছি না। নদীটা সত্যি আছে এবং আমার কোনো ক্ষমতা যে নেই তাও ঠিক না। কিছু ক্ষমতা আছে।

কেমন?

যেমন ধর, আজ তোমাকে নিতে গাড়ি আসবে না। তোমাকে রিকশা নিয়ে ফিরতে হবে।

এটা ঠিক হয়েছে। কাকতালীয়ভাবে বলে ফেলেছ। আমাদের গাড়ি গ্যারেজে। সাইলেন্সার পাইপ নষ্ট হয়ে গেছে। সারাতে দিয়েছে।

এছাড়াও আমি বলতে পারি তোমার হ্যান্ডব্যাগে কত টাকা আছে।

কত আছে?

একশ টাকার নোট আছে দুইটা, একটা কুড়ি টাকার নোট। এক টাকার নোট আছে সাতটা। কিছু খুচরা পয়সা, কত বলতে পারছি না।

রূপা হাসিমুখে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, বাক্স খুলে তুমি গুনে দেখ ঠিক বললাম কি না।

আমি গুনতে চাই না।

গুনতে চাও না কেন?

গুনলে দেখা যাবে তুমি ঠিক বল নি। তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে যাবে। তোমার কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে এটা বিশ্বাস করতে আমার ভালো লাগছে। চারদিক এতসব সাধারণ মানুষ—এর মধ্যে এক জন কেউ থাকুক যে সাধারণ নয়, অসাধারণ।

তুমি গুনে দেখ না।

রূপা শুনল এবং অবাক হয়ে বলল, কী করে হলো? কী করে তুমি বলতে পারলে?

আমি বললাম, আমি জানি না রূপা। মাঝে মাঝে কাকতালীয়ভাবে আমার কিছু কিছু কথা মিলে যায়। আচ্ছা আমি যাই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। রূপা পুরোপুরি বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

পরের তিনমাস আমি ইউনিভার্সিটিতে গেলাম না। আমি জানি রূপা আমাকে খুঁজবে। যা পাওয়া যায় না তার প্রতি আমাদের আগ্রহের সীমা থাকে না। মেঘ আমরা কখনো স্পর্শ করতে পারি না বলেই মেঘের প্রতি মমতার আমাদের সীমা নেই।

তিন মাস পর হঠাৎ একরাতে রূপাদের বাসায় টেলিফোন করে বললাম, রূপা তুমি কেমন আছ?

ভালো।

চিনতে পারছ?

চিনতে পারব না কেন? তুমি কোথায় ডুব মেরেছিলে?

মামার বাড়ি গিয়েছিলাম।

মামার বাড়ি? ক্লাস ফাঁকি দিয়ে মামার বাড়ি?

হ্যাঁ মামার বাড়ি। হঠাৎ ওদের খুব দেখতে ইচ্ছা করল।

তারা কি খুব চমৎকার মানুষ?

না। তারা পিশাচ শ্রেণীর।

কী সব কথা যে তুমি বল।

সত্যি বলছি। আমার তিন মামা। তিন জনই পিশাচ। তবে এক জন মারা গেছেন। এখন দুই জন আছেন। তারা পিশাচ হলেও আমাকে খুব স্নেহ করেন।

তোমার বাবা-মার কথা বল।

মার কথা বলতে পারব না। তেমন কিছু জানি না।

তোমার বাবার কথা বল।

বাবা ছিলেন এক জন চমৎকার মানুষ। তবে বাবা একবার একটা টিয়াপাখিকে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন।

তুমি এমন সব অদ্ভুত কথা বল কেন?

কী করব বল, আমার চারপাশে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে।

রূপা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি কি জানো আমি তোমার কথা খুব ভাবি।

আমি জানি।

সত্যি জানো?

হ্যাঁ জানি।

কী করে জানো?

ভালোবাসা টের পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে রূপা বলল, কেন জানি তোমার কথা সবসময় মনে হয়। এর নাম কি ভালোবাসা?

আমার জানা নেই রূপা।

তুমি কি আসবে আমাদের বাসায়?

আসব।

কখন আসবে?

এক্ষুণি আসছি।

এত রাতে এলে বাবা হইচই শুরু করবেন। তুমি কি সকালে আসতে পার না?

না রূপা, আমাকে এক্ষুণি আসতে হবে।

আচ্ছা বেশ আস।

তোমার কি কোনো নীল রঙের শাড়ি আছে?

কেন বল তো।

যদি থাকে তাহলে নীল রঙের শাড়ি পরে গেটের কাছে থাকো। আমি এলেই গেট খুলে দেবে।

আচ্ছা।

আমি গেলাম না। আবারো মাসখানিকের জন্যে ডুব দিলাম। কারণ ভালোবাসার মানুষদের খুব কাছে কখনো যেতে নেই।

৮

আমি রূপাকে কখনো চিঠি লিখি নি। একবার হঠাৎ একটি চিঠি লিখতে ইচ্ছা হলো। লিখতে বসে দেখি কী লিখব ভেবে পাচ্ছি না। অনেকবার করে একটি লাইন লিখলাম :

রূপা তুমি কেমন আছ?

সমস্ত পাতা জুড়ে একটি মাত্র বাক্য।

সেই চিঠির উত্তরে রূপা খুব রাগ করে করে লিখল :

> তুমি এত পাগল কেন? এতদিন পর একটা চিঠি লিখলে, তারমধ্যেও পাগলামি। কেন এমন কর? তুমি কি ভাবো এইসব পাগলামি দেখে আমি তোমাকে আরো বেশি ভালোবাসব?

> তোমার কাছে আমি হাতজোড় করছি—স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরণ কর। ঐদিন দেখলাম দুপুরের কড়া রোদে কেমন পাগলের মতো হাঁটছ। বিড়বিড় করে আবার কীসব যেন বলছ। দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল। তোমার কী সমস্যা তুমি আমাকে বল।

আমার সমস্যার কথা রূপাকে কি আমি বলতে পারি? আমি কি বলতে পারি—আমার বাবার স্বপ্ন সফল করার জন্য সারাদিন আমি পথে পথে ঘুরি। মহাপুরুষ হবার সাধনা করি। যখন খুব ক্লান্তি অনুভব করি তখন একটি নদীর স্বপ্ন দেখি। যে নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এক জন তরুণী ছুটে চলে যায়। একবার শুধু থমকে দাঁড়িয়ে তাকায় আমার দিকে। তার চোখে গভীর মায়া ও গাঢ় বিষাদ। এই তরুণীটি আমার মা। আমার বাবা যাকে হত্যা করেছিলেন।

এইসব কথা রূপাকে বলার কোনো অর্থ হয় না। বরং কোনো-কোনোদিন তরঙ্গিণী স্টোর থেকে তাকে টেলিফোন করে বলি—রূপা, তুমি কি এক্ষুণি নীল রঙের একটা শাড়ি পরে তোমাদের ছাদে উঠে কার্নিশ ধরে নিচের দিকে তাকাবে? তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। একটুখানি দাঁড়াও। আমি তোমাদের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে যাব।

আমি জানি রূপা আমার কথা বিশ্বাস করে না, তবু যত্ন করে শাড়ি পরে। চুল বাঁধে। চোখে কাজলের ছোঁয়া লাগিয়ে ছাদের কার্নিশ ধরে দাঁড়ায়। সে অপেক্ষা করে। আমি কখনো যাই না।

আমাকে তো আর দশটা সাধারণ ছেলের মতো হলে চলবে না। আমাকে হতে হবে অসাধারণ। আমি সারাদিন হাঁটি। আমার পথ শেষ হয় না। গন্তব্যহীন যে যাত্রা তার কোনো শেষ থাকার তো কথাও নয়।